বললেন ঃ وعليكم السلام ورحمة الله ---এরপর এক ব্যক্তি এসে সালাম করল ঃ السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله---তিনি জওয়াবে আরও একটি শব্দ যোগ করে বললেন ঃ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته--অতঃপর এক ব্যক্তি এসে উপরোক্ত তিনটি শব্দ সহযোগে বলল ঃ السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته তিনি উত্তরে শুধু একটি শব্দ অর্থাৎ وعليك বললেন। লোকটির মনে প্রশ্ন দেখা দিল। সে আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ---প্রথমে যারা এসেছিল, তাদের উত্তরে আপনি কয়েকটি দোয়ার শব্দ বলেছেন। আমি সবগুলো শব্দ সহযোগে সালাম করলে আপনি শুধু وعليك বললেন কেন? তিনি বললেন ঃ তুমি আমার জন্য জওয়াবে বাড়াবার মত কোন শব্দই রাখনি। তুমি সবগুলো শব্দ সালামে ব্যবহার করে ফেলেছ। তাই আমি কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী 'অনুরূপ শব্দ' দ্বারা জওয়াব দিয়েছি। এ রেওয়ায়েতটি ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতেম বিভিন্ন সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রথমত জানা গেল যে, আয়াতে সালামের জওয়াব আরও উত্তম ভাষায় দেওয়ার যে নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, এর অর্থ এই যে, সালামকারীর ব্যবহৃত শব্দ বাড়িয়ে জওয়াব দেওয়া। উদাহরণত সে যদি السلام عليكم---বলে তবে আপনি জওয়াবে وعليكم السلام ورحمة الله---বলুন। সে যদি السلام عليكم ورحمة الله বলে, তবে আপনি وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته বলুন।

দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, তিনটি শব্দ পর্যন্ত বাড়ানোই সুন্নত। এর চাইতে আরও বেশী বাড়ানো সুন্নত নয়। এর কারণ এই যে, সালামের স্থান সংক্ষিপ্ত বাক্য চায়। এখানে এত দীর্ঘ বাক্য সমীচীন নয়, যা কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে কিংবা শ্রোতার কাছে ভারী মনে হয়। তাই জনৈক ব্যক্তি যখন প্রথম সালামেই তিনটি শব্দ ব্যবহার করে ফেলে, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বাক্যকে আরও বাড়ানো থেকে বিরত থাকেন। এর আরও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তিনের চাইতে অধিক শব্দ প্রয়োগকারীকে বাধা দিয়ে বলেন ঃ ان السلام قد انتهى الى البركة---অর্থাৎ 'বরকত' শব্দে পৌঁছে সালাম শেষ হয়ে যায়। এর বেশী বলা সুন্নত নয়।

তৃতীয়ত জানা গেল যে, সালামে 'তিন' শব্দ উচ্চারণকারীর জওয়াবে যদি 'এক' শব্দই বলে দেওয়া হয়, তবে তাও অনুরূপ শব্দ দ্বারা জওয়াব দেওয়ার মতই এবং কোরআনের নির্দেশ أَوْ رُدُّوهَا পালনের পক্ষে যথেষ্ট; যেমন, এ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) একটিমাত্র শব্দই উচ্চারণ করেছেন।---(মাযহারী)

আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু হল এই যে, কোন মুসলমানকে সালাম করা হলে তার জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত জওয়াব না দিলে সে গোনাহ্গার

হবে। তবে জওয়াবে ইচ্ছা করলে যে বাক্যে সালাম করা হয়, তার চাইতে উত্তম বাক্যে জওয়াব দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে হুবহু সে বাক্যেও জওয়াব দিতে পারে।

এ আয়াতে সালামের জওয়াব দেওয়া যে ওয়াজিব, তা তো স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু প্রথমাবস্থায় সালাম করা ওয়াজিব কি না তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়নি। তবে اذا حييتم বাক্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এ শব্দটিকে مجهول এবং কর্তা নির্দিষ্ট না করে উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, সব মুসলমানই অভ্যাসগতভাবে সালাম করে।

মসনদে-আহমদ, তিরমিযী ও আবূ-দাউদে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম করে, সে আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক নৈকট্যশীল।

পূর্বোল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে সালামের প্রতি জোর তাকীদ ও সালামের ফযীলত আপনি শুনেছেন। এগুলো থেকে এতটুকু অবশ্যই জানা যায় যে, প্রথমাবস্থায় সালাম করাও সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ থেকে কম নয়। তফসীরে বাহ্রে-মুহীতে বলা হয়েছে, অধিকাংশ আলিমের মতে প্রাথমিক সালাম সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ السلام تطوع والرد فريضة—অর্থাৎ, প্রথমাবস্থায় সালাম করা ইচ্ছাগত ব্যাপার, কিন্তু সালামের জওয়াব দেওয়া ফরয।

কোরআনী নির্দেশের ব্যাখ্যা হিসাবে রসূলুল্লাহ্ (সা) সালাম ও সালামের জওয়াব সম্পর্কে আরও কিছু বিবরণ দান করেছেন, সংক্ষেপে সেগুলোও শুনে নিন। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি যানবাহনে সওয়ার, তার উচিত পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে সালাম করা। যে চলমান, সে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম করবে এবং যারা কম সংখ্যক তারা বেশী সংখ্যকের কাছ দিয়ে গেলে প্রথমে তাদেরকে সালাম করবে।

তিরমিযীর এক হাদীসে আছে, যখন কেউ বাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন বাটীস্থ লোকদেরকে সালাম করা উচিত। এতে উভয় পক্ষের জন্য বরকত হবে।

আবূ দাউদের এক হাদীসে আছে, কোন মুসলমানের সাথে বারবার দেখা হলে প্রত্যেক বার সালাম করা উচিত। সাক্ষাতের প্রথমে সালাম করা যেমন সুন্নত তেমনি বিদায় মুহূর্তে সালাম করাও সুন্নত এবং সওয়াবের কাজ।---(তিরমিযী, আবূ দাউদ)

সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব; কিন্তু এতে কয়েকটি ব্যতিক্রম রয়েছে। নামাযরত ব্যক্তিকে কেউ সালাম করলে জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব নয়। বরং জওয়াব দিলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি খুতবা দেয় বা কোরআন তিলাওয়াত করে কিংবা আযান, ইকামত বলে, ধর্মীয় গ্রন্থ পড়ায় কিংবা মানবিক প্রয়োজনে প্রস্রাব ইত্যাদিতে রত, তাকে সালাম করাও জায়েয নয় এবং তার পক্ষে জওয়াব দেওয়াও ওয়াজিব নয়।

বিষয়বস্তুর উপসংহারে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর হিসাব নেবেন। মানুষ এবং ইসলামী অধিকার; যথা সালাম ও সালামের জওয়াব ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোরও হিসাব নেবেন।

এরপর বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ—অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাকেই উপাস্য মনে কর এবং যে কাজ কর, তাঁর ইবাদতের নিয়তে কর। তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্র করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। ঐ দিন সবাইকে প্রতিদান দেবেন। কিয়ামতের ওয়াদা, প্রতিদান ও শাস্তির সংবাদ সব সত্য। وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا—কেননা, এ সংবাদ আল্লাহ্র দেয়া। আল্লাহ্র চাইতে অধিক কার কথা সত্য হতে পারে?

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ
اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ
لَهٗ سَبِيْلًا ۝ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا
تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ
وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا
قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ
فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ
عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۝ سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ
وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ

لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ
سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝

(৮৮) অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু'দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে। তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ্ যাকে পথভ্রান্ত করেন, তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না। (৮৯) তারা চায় যে, তারা যেমন কাফির, তোমরাও তেমনি কাফির হয়ে যাও—যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না; (৯০) কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি আছে অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেন নি। (৯১) এখন তুমি আরও এক সম্প্রদায়কে পাবে। তারা তোমাদের কাছেও এবং স্বজাতির কাছেও নির্বিঘ্ন হয়ে থাকতে চায়। যখন তাদেরকে ফ্যাসাদের প্রতি মনোনিবেশ করানো হয়, তখন তারা তাতে নিপতিত হয়, অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়, তোমাদের সাথে সন্ধি না রাখে এবং স্বীয় হস্তসমূহকে বিরত না রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তি-প্রমাণ দান করেছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনটি বিভিন্ন দল ও তার বিধি ঃ (তোমরা ধর্মত্যাগী প্রথম দলের অবস্থা দেখে নিয়েছ—) অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা (মতবিরোধ করে) দু'দল হয়ে গেলে? (একদল তাদেরকে এখনও মুসলমান বলে) অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (তাদের প্রকাশ্য কুফরীর দিকে) ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের (মন্দ) কর্মের কারণে। (এ মন্দ কর্ম হচ্ছে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ধর্মবিমুখ হয়ে দারুল-ইসলাম তথা ইসলামী দেশকে ত্যাগ করা। এটি তখন ইসলামের স্বীকারোক্তি বর্জন করার মতই কুফরীর লক্ষণ ছিল। বাস্তবে তারা পূর্বেও মুসলমান ছিল না। তাই তাদেরকে মুনাফিক বলা

হয়েছে)। তোমরা কি (ঐসব লোক, যারা দারুল-ইসলাম ত্যাগ করা যে কুফরীর লক্ষণ, তা জানে না) তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা (পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করার কারণে) পথভ্রষ্টতায় ফেলে রেখেছেন? (আল্লাহ্ তা'আলার রীতি এই যে, কেউ কোন কাজ করতে দৃঢ়সংকল্প হলে, আল্লাহ্ সে কাজ সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, অমু'মিন পথভ্রষ্টকে পথপ্রাপ্ত মু'মিন বলা তোমাদের জন্য বৈধ নয়)। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার (মু'মিন হওয়ার) জন্য কোন পথ পাবে না। (অতএব তাদেরকে মু'মিন বলা উচিত নয়। তারা মু'মিন হবে কি রূপে? কুফরে বাড়াবাড়িতে তাদের অবস্থা এই যে,) তাদের বাসনা এই যে, তারা যেমন কাফির, তোমরাও (আল্লাহ্ না করুন) তেমনি কাফির হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব (তাদের অবস্থা যখন এই, তখন) তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, (অর্থাৎ কারও সাথে মুসলমানের মত ব্যবহার করো না। কেননা, বন্ধুত্ব বৈধ হওয়ার জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত)। যে পর্যন্ত না তারা পূর্ণরূপে মুসলমান হওয়ার জন্য হিজরত করে। কেননা, এখন কালেমায়ে শাহাদাত স্বীকার করা যেমন জরুরী, তখন হিজরত করাও তেমনি জরুরী ছিল। 'পূর্ণরূপে মুসলমান হওয়ার জন্য' কথাটি যুক্ত করার কারণ এই যে, শুধু দারুল ইসলামে আগমন করাই যথেষ্ট নয়। ব্যবসায়ী কাফিররাও দারুল ইসলামে আগমন করে। বরং ইসলামী মর্যাদা সহকারে আগমন করতে হবে। অর্থাৎ মুসলমান হওয়াও প্রকাশ করতে হবে যাতে স্বীকারোক্তি ও হিজরত উভয়ই অর্জিত হয়। আন্তরিক স্বীকারোক্তি আছে কি না, তা আল্লাহ্ তা'আলারই জানার বিষয়। এটি খোঁজাখুঁজি করার প্রয়োজন মুসলমানদের নেই)। অতঃপর যদি তারা (ইসলাম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, (এবং কাফিরই থেকে যায়) তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর (এ পাকড়াও করা হয় হত্যার জন্য, না হয় ক্রীতদাস করার জন্য)। এবং তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না। উদ্দেশ্য এই যে, কোন অবস্থাতেই তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রেখো না, শান্তিকালে বন্ধুত্ব রেখো না এবং যুদ্ধকালে সাহায্য চেয়ো না; বরং পৃথক থাক।)

দ্বিতীয় দল ঃ কিন্তু (কাফিরদের মধ্যে) যারা (তোমাদের সাথে সন্ধিবদ্ধ থাকতে চায়, যার পন্থা দু'টি ঃ এক, সন্ধির মাধ্যমে হবে অর্থাৎ) এমন লোকদের সাথে মিলিত হয় (অর্থাৎ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়) যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে (সন্ধি) চুক্তি রয়েছে; (যথা, বনী মুদলাজ। তাদের সাথে সন্ধি হওয়ার ফলে তাদের মিত্ররাও এ ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অতএব বনী মুদলাজ আরও নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমভুক্ত)। অথবা (দ্বিতীয় পন্থা এই যে, সন্ধির মাধ্যম ছাড়াই হবে---এভাবে যে,) স্বয়ং তোমাদের কাছে এভাবে আসবে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক হবে। (তাই স্বজাতির পক্ষ হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং তোমাদের পক্ষে হয়েও স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না; বরং উভয় পক্ষের সাথে শান্তির সম্পর্ক রাখবে। অতএব, উল্লিখিত উভয় পন্থার মধ্যে যে কোন পন্থায় কেউ তোমাদের সাথে সন্ধিবদ্ধ থাকতে চাইবে, সে উল্লিখিত 'পাকড়াও ও হত্যার' আদেশের আওতা-বহির্ভূত থাকবে)। এবং (তারা যে সন্ধির আবেদন করে, এজন্য তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্বীকার

কর। কারণ, তিনি তাদের অন্তরে তোমাদের ভীতি সঞ্চার করে দিয়েছেন। নতুবা) যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল (ও নির্ভীক) করে দিতেন; তাহলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত (কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে এ ভোগান্তি থেকে রক্ষা করেছেন)। অতঃপর (সন্ধি করে) যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে অর্থাৎ তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে নিরাপত্তার সম্পর্ক বজায় রাখে, (এসব বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের সাথে শান্তিতে থাকে। তাকীদের জন্য একাধিক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে) তবে (এ শান্তিকালে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে (হত্যা, বন্দী ইত্যাদি করার) কোন পথ দেন নি (অর্থাৎ অনুমতি দেন নি)।

তৃতীয় দল ঃ তোমরা কতক এরূপও অবশ্যই পাবে (অর্থাৎ তাদের এ অবস্থা জানা যাবে) যে, (প্রতারণাপূর্বক) তারা তোমাদের কাছেও এবং স্বজাতির কাছেও নির্বিঘ্ন হয়ে থাকতে চায় (এবং এর সাথে সাথেই) যখন তাদেরকে (প্রকাশ্য শত্রুদের পক্ষ থেকে) দুষ্টামির (ও হাঙ্গামার) প্রতি মনোনিবেশ করানো হয়, তখন তারা (তৎক্ষণাৎ) তাতে (অর্থাৎ দুষ্টামিতে) নিপতিত হয় (অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়ে যায় এবং প্রতারণাপূর্ণ সন্ধি ভঙ্গ করে)। অতএব, তারা যদি (সন্ধি ভঙ্গ করে এবং) তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয় এবং তোমাদের সাথে নিরাপত্তা বজায় না রাখে এবং স্বীয় হস্তসমূহকে (তোমাদের মুকাবিলা থেকে) বিরত না রাখে (এসব কথার অর্থ আগের মত এক; অর্থাৎ যদি সন্ধি ভঙ্গ করে) তবে তোমরা (-ও) তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও, হত্যা কর। আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তি-প্রমাণ দান করেছি। (তদ্দ্বারা তাদের হত্যার বৈধতা সুস্পষ্ট। তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করাই হচ্ছে এর যুক্তি প্রমাণ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে তিনটি দলের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে দু'টি বিধান উল্লিখিত হয়েছে। এসব দলের ঘটনাবলী নিম্নোদ্ধৃত রেওয়ায়েতগুলো থেকে জানা যাবে।

প্রথম রেওয়ায়েত ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে হুমাইদ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক-বার কতিপয় মুশরিক মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করে এবং প্রকাশ করে যে, তারা মুসলমান; হিজরত করে মদীনায় এসেছে। কিছুদিন পর তারা ধর্মত্যাগী হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে পণ্যদ্রব্য আনার অজুহাত পেশ করে পুনরায় মক্কা চলে যায়। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি। এদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। কেউ কেউ বলল ঃ এরা কাফির আর কেউ কেউ বলল ঃ এরা মু'মিন। আল্লাহ্ তা'আলা فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ—আয়াতে এদের কাফির হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং এদেরকে হত্যা করার বিধান দিয়েছেন।

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন ঃ এদেরকে

এ অর্থে মুনাফিক বলা হয়েছে যে, যখন এরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করছিল, তখনও অন্তরের সাথে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। ফলে মুনাফিকই ছিল। মুনাফিকরা যতক্ষণ কুফর গোপন রাখত, ততক্ষণ তাদেরকে হত্যা করা হত না। এদের কুফর প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে যারা এদেরকে মুসলমান বলেছিল, তারা সম্ভবত সু-ধারণার বশবর্তী হয়ে বলে থাকবে এবং এদের কুফরের প্রমাণাদির কোন সমর্থ করে থাকবে। কিন্তু তাদের সদর্থের ভিত্তি হয়তো ব্যক্তিগত মতামত ছিল এবং কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণের সমর্থন এর পেছনে ছিল না। তাই তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়েনি।

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত ঃ ইবনে আবী শায়বা হাসান বসরী থেকে বর্ণনা করেন যে, বদর ও ওহুদ যুদ্ধের পর সুরাকা ইবনে মালেক মুদলাজী রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানাল, আমাদের গোত্র বনী মুদলাজের সাথে সন্ধি স্থাপন করুন। তিনি হযরত খালেদকে সন্ধি সম্পন্ন করার জন্য সেখানে প্রেরণ করলেন। সন্ধির বিষয়বস্তু ছিল এই ঃ

আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করব না। কুরায়শরা মুসলমান হয়ে গেলে আমরাও মুসলমান হয়ে যাব। যেসব গোত্র আমাদের সাথে একতাবদ্ধ হবে, তারাও এ চুক্তিতে আমাদের অংশীদার।

এর পরিপ্রেক্ষিতে وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ থেকে إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তৃতীয় রেওয়ায়েত ঃ হযরত ইবনে-আববাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, سَتَجِدُونَ آخَرِينَ ..... আয়াতে আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা মদীনায় এসে বাহ্যত নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করত এবং স্বগোত্রের কাছে বলত, আমরা তো বানর ও বিচ্ছুদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তারাই আবার মুসলমানদের কাছে বলত, আমরা তোমাদের ধর্মে আছি!

যাহ্হাক, হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বনি আবদুদ্দারেরও একই অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েত রূহুল-মা'আনীতে এবং তৃতীয় রেওয়ায়েত মা'আলেমে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত থানভী (র) বলেন ঃ তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের অবস্থা প্রথম রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের অবস্থার মতই হয়ে গেছে। অর্থাৎ তারা যে পূর্ব থেকেই মুসলমান নয়, একথা রেওয়ায়েত থেকেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ কারণেই তারা সাধারণ কাফিরদের অনুরূপ। অর্থাৎ সন্ধিচুক্তি থাকাকালে তাদের সাথে যুদ্ধ করা চলবে না। কিন্তু সন্ধিচুক্তি না থাকা অবস্থায় যুদ্ধ করা চলবে। সেমতে প্রথম রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ

---গ্রেফতার করা ও হত্যা করার নির্দেশ এবং তৃতীয় আয়াত إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ ---শাস্তিচুক্তির সময় তাদের ব্যতিক্রম বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে তাদের শাস্তিচুক্তি উল্লিখিত হয়েছে। ব্যতিক্রমকে জোরদার করার জন্য পুনরায় فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ..... বলে দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে চতুর্থ আয়াত অর্থাৎ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ...-তে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়; বরং লড়াই করে, তবে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। এ থেকে বোঝা যায় যে, তারা সন্ধিচুক্তি করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না।---(বয়ানুল-কোরআন)

মোট কথা, এখানে তিন দল লোকের কথা উল্লিখিত হয়েছে ঃ

১. মুসলমান হওয়ার জন্য যে সময় হিজরত করা শর্ত সাব্যস্ত হয়, সে সময় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হিজরত না করে কিংবা হিজরত করার পর দারুল ইসলাম ত্যাগ করে দারুল-হরবে চলে যায়।

২. যারা স্বয়ং মুসলমানদের সাথে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি করে কিংবা এরূপ চুক্তিকারীদের সাথে চুক্তি করে।

৩. যারা সাময়িকভাবে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তিচুক্তি করে। অতঃপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহবান জানানো হলে তাতে অংশগ্রহণ করে এবং চুক্তিতে কায়েম না থাকে।

প্রথম দল সাধারণ কাফিরদের মত। দ্বিতীয় দল হত্যা ও ধর-পাকড়ের আওতা-বহির্ভূত এবং তৃতীয় দল প্রথম দলের অনুরূপ শাস্তির যোগ্য। এসব আয়াতে মোট দু'টি বিধান উল্লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ সন্ধিচুক্তি না থাকাকালে যুদ্ধ এবং সন্ধিচুক্তি থাকাকালে যুদ্ধ নয়।

হিজরতের বিভিন্ন প্রকার ও বিধান ঃ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ.... ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফিরদের দেশ থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয ছিল।[১] এ কারণে যারা এ ফরয পরিত্যাগ করত, তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের মত ব্যবহার করতে নিষেধ করে দেন। মক্কা বিজিত হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)

১. হিজরত সম্পর্কিত আলোচনার জন্য সূরা নিসার ১০০ তম আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য।

ঘোষণা করেনঃ لا هجرة بعد الفتح অর্থাৎ মক্কা বিজিত হয়ে যখন দারুল-ইসলাম হয়ে গেল, তখন সেখান থেকে হিজরত করা ফরয নয়। --(বুখারী) এটা ছিল তখনকার কথা যখন হিজরত ঈমানের শর্ত ছিল। তখন সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হিজরত করত না, তাকে মুসলমান মনে করা হত না। কিন্তু পরে এ বিধান রহিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছেঃ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة অর্থাৎ যতদিন তওবা কবুল হওয়ার সময় থাকবে, ততদিন হিজরত বাকী থাকবে।---(বুখারী)

এ হিজরত সম্পর্কে বুখারীর টীকাকার আল্লামা আইনী লিখেনঃ ان المراد بالهجرة الباقية هى هجر السيئات অর্থাৎ স্থায়ী হিজরতের অর্থ হচ্ছে পাপকর্ম পরিত্যাগ করা। যেমন, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি মুহাজির, যে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করে।--- (মিরকাত, প্রথম খণ্ড)

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, পরিভাষায় হিজরত দু' অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ (১) ধর্মের খাতিরে দেশ ত্যাগ করা; যেমন সাহাবায়ে কিরাম স্বদেশ মক্কা ছেড়ে মদীনা ও আবিসিনিয়ায় চলে যান। (২) পাপ কাজ বর্জন করা।

وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ---এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হারাম। বর্ণিত আছে যে, আনসাররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কাফিরদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেনঃ الخبيث لا حاجة لنا بهم অর্থাৎ এরা দুরাচারী জাতি। আমাদের তাদের প্রয়োজন নেই।---(মাযহারী, ২য় খণ্ড)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
خَطَاً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ
اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۭ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۭ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ
فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۡ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ
خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

(৯২) মুসলমানের কাজ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে ; কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং খুনের বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদের ; কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে খুনের বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে গোনাহ্ মাফ করানোর জন্যে উপর্যুপরি দুই মাস রোযা রাখবে। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৯৩) যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কোন ঈমানদারের উচিত নয় যে, কোন মু'মিনকে (প্রথমত) হত্যা করে ; কিন্তু ভ্রমবশত (হয়ে গেলে তা ভিন্ন কথা) এবং যে ব্যক্তি কোন বিশ্বাসীকে ভ্রমবশত হত্যা করে, তার উপর (শরীয়তের আইনে) একজন মুসলমান ক্রীতদাস কিংবা দাসীকে মুক্ত করা (ওয়াজিব) এবং রক্ত-বিনিময় (-ও ওয়াজিব), যা তার (নিহত ব্যক্তির) স্বজনদেরকে (অর্থাৎ, যারা ওয়ারিস, তাদেরকে ওয়ারিসীর অংশ অনুযায়ী) সমর্পণ করবে। (যার কোন ওয়ারিস নেই; তার রক্ত-বিনিময় সরকারী ধনাগারে জমা হবে।) তবে যদি তারা (এ রক্ত-বিনিময়) ক্ষমা করে দেয় (সম্পূর্ণ ক্ষমা করুক কিংবা আংশিক--যতটুকু ক্ষমা করবে, ততটুকুই ক্ষমা হবে।) এবং যদি সে (ভ্রমবশত নিহত ব্যক্তি) তোমাদের শত্রু-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত (অর্থাৎ দারুল-হরবের বাসিন্দা এবং কোন কারণে তাদের মধ্যে বসবাসকারী হয়) এবং সে নিজে বিশ্বাসী হয়, তবে (শুধু) একজন মুসলমান ক্রীতদাস ও বাঁদী মুক্ত করা জরুরী হবে। (রক্ত বিনিময় দিতে হবে না। এ ক্ষেত্রে রক্ত-বিনিময় ওয়াজিব না হওয়ার কারণ এই যে, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসরা মুসলমান হলে তারা ইসলামী সরকারের অধীনে বসবাস না করার কারণে রক্ত-বিনিময়ের হকদার নয়। পক্ষান্তরে ওয়ারিসরা কাফির হলে রক্ত-বিনিময় সরকারী ধনাগারের প্রাপ্য হতো। কিন্তু কোন ত্যাজ্য সম্পত্তি দারুল-হরব থেকে দারুল-ইসলামের ধনাগারে স্থানান্তর করা হয় না।) আর যদি সে (ভুলবশত নিহত ব্যক্তি) এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে (শান্তির কিংবা যিম্মী হওয়ার) চুক্তি আছে, (অর্থাৎ সে যদি যিম্মী কিংবা শান্তি চুক্তিবদ্ধ

বদ্ধ ও অভয় প্রাপ্ত হয়) তবে রক্ত-বিনিময় (-ও ওয়াজিব), যা তার (নিহতের) স্বজন-দেরকে (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা ওয়ারিস, তাদেরকে) সমর্পণ করা হবে। (কেননা, কাফির কাফিরের ওয়ারিস হয়---) এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস কিংবা বাঁদী মুক্ত করা (জরুরী হবে)। অতঃপর (যে ক্ষেত্রে ক্রীতদাস কিংবা বাঁদী মুক্ত করা ওয়াজিব।) যে ব্যক্তি (ক্রীতদাস কিংবা বাঁদী) না পায় (এবং ক্রয় করার ক্ষমতাও না থাকে) তবে (তার দায়িত্বমুক্ত করার পরিবর্তে) একাদিক্রমে (অর্থাৎ উপর্যুপরি) দুই মাস রোযা। (এ দাসমুক্তি এবং তা সম্ভব না হলে ক্রমাগত ২ মাসের রোযা রাখা) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত তওবা হিসাবে (অর্থাৎ এ পন্থা আইনসিদ্ধ হয়েছে)। এবং আল্লাহ্ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা উপযোগিতা অনুসারে বিধান নির্ধারণ করেছেন; যদিও সর্বক্ষেত্রে তাঁর প্রজ্ঞা সম্পর্কে বান্দার জানা নেই।) আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার (আসল) শাস্তি (তো) জাহান্নাম, (অর্থাৎ জাহান্নামে এভাবে থাকা যে,) চিরকাল তথায় বাস করবে (কিন্তু আল্লাহ্র কৃপায় এ আসল শাস্তি কার্যকরী হবে না; বরং ঈমানের কল্যাণে অবশেষে মুক্তি পাবে) এবং তার প্রতি (নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত) আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হবেন এবং তাকে স্বীয় (বিশেষ) রহমত থেকে দূরে রাখবেন এবং তার জন্য বিরাট শাস্তি (অর্থাৎ দোযখের শাস্তি) প্রস্তুত করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্ব থেকে হত্যা ও যুদ্ধের আলোচনা চলে এসেছে। প্রাথমিক হত্যা সর্বমোট আট প্রকার। কেননা, নিহত ব্যক্তি হয় মুসলমান, না হয় যিম্মী, না হয় চুক্তিবদ্ধ ও অভয়প্রাপ্ত এবং না হয় দারুল হরবের কাফির হবে! এ চার অবস্থার কোন-না-কোন একটি হবেই। হত্যা দুই প্রকার ঃ হয় ইচ্ছাকৃত, না হয় ভ্রমবশত। অতএব, মোট প্রকার হল আটটি ঃ এক. মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, দুই. মুসলমানকে ভ্রমবশত হত্যা, তিন. যিম্মীকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, চার. যিম্মীকে ভ্রমবশত হত্যা, পাঁচ. চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, ছয়. চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ভ্রমবশত হত্যা, সাত. হরবী কাফিরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং আট. হরবী কাফিরকে ভ্রমবশত হত্যা।

এসব প্রকারের মধ্যে কিছু সংখ্যকের বিধান পূর্বে বলা হয়েছে, আর কিছু পরে বর্ণিত হবে এবং কিছু সংখ্যকের বিধান হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে। প্রথম প্রকারের পার্থিব বিধান অর্থাৎ কিসাস ওয়াজেব হওয়া সম্পর্কে সূরা বাক্বারায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং পারলৌকিক বিধান পরবর্তী আয়াতে وَمَنْ يَّقْتُلْ এ বর্ণিত হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ থেকে

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ আয়াতে আসবে। তৃতীয় প্রকারের বিধান

দারে-কুত্নীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যিম্মী হত্যার বিনিময়ে রসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানের কাছ থেকে কিসাস নিয়েছেন।---(তাখরীজে-হেদায়া) চতুর্থ প্রকার وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ আয়াতে উল্লিখিত হবে। পঞ্চম প্রকারের বিধান পূর্ববর্তী রুকূর فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ প্রকারের বিধান চতুর্থ প্রকারের সাথেই উল্লিখিত হয়েছে। কেননা, مِّيْثَاقٌ তথা চুক্তি অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় প্রকারই হতে পারে। অতএব, যিম্মী ও অভয়প্রাপ্ত উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। দুর্রে-মুখতার গ্রন্থের 'দিয়্যাত' অধ্যায়ের শুরুতে অভয়প্রাপ্ত কাফিরের রক্ত-বিনিময় ওয়াজিব হওয়ার মাস'আলা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান স্বয়ং জিহাদ আইনসিদ্ধ হওয়ার মাস'আলা থেকে পূর্বেই জানা গেছে। কেননা জিহাদে দারুল-হরবের কাফিরদের ইচ্ছাকৃতভাবেই হত্যা করা হয়। অতএব, ভ্রমবশত হত্যার বৈধতা আরও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হবে। ---(বয়ানুল-কোরআন)

তিন প্রকার হত্যা ও তার বিধান ঃ প্রথম প্রকার عمد অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যা। এর সংজ্ঞা এই ঃ বাহ্যত ইচ্ছা করে এমন অস্ত্র দ্বারা হত্যা করা, যা লৌহনির্মিত অথবা অঙ্গছেদনের ব্যাপারে লৌহনির্মিত অস্ত্রের মত; যথা ধারাল বাঁশ, ধারাল পাথর ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার شبه عمد অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ। এর সংজ্ঞা এই ঃ ইচ্ছা করেই হত্যা করা, কিন্তু এমন অস্ত্র দ্বারা নয়, যদ্দ্বারা অঙ্গছেদ হতে পারে।

তৃতীয় প্রকার خَطَأً অর্থাৎ ভ্রমবশত হত্যা। ইচ্ছা ও ধারণায় ভ্রম হওয়া! যেমন, দূর থেকে মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল-হরবের কাফির মনে করে গুলী করা কিংবা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটা। যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলী ছোঁড়া; কিন্তু তা কোন মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া। এগুলো ভ্রমবশত হত্যার অন্তর্ভুক্ত। এখানে ভ্রম বলে 'ইচ্ছা নয়' বোঝানো হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত। উভয় প্রকারের মধ্যে গোনাহ্ ও রক্ত-বিনিময়ের বিধান রয়েছে। তবে উভয় প্রকারের গোনাহ্ ও রক্ত-বিনিময় ভিন্ন প্রকার। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময় হচ্ছে একশ উট। উটগুলো চার প্রকারের হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে পঁচিশটি করে উট থাকবে। তৃতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময়ও একশ উট। কিন্তু উটগুলো হবে পাঁচ প্রকারের। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারে বিশটি করে উট থাকবে। তবে রক্ত-বিনিময় মুদ্রার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকারে দশ হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দীনার দিতে হবে। ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ্ বেশী এবং তৃতীয় প্রকারের গোনাহ্ কম। অর্থাৎ শুধু অসাবধানতার গোনাহ্ হবে।----(হেদায়া) ক্রীতদাস মুক্তকরণ ওয়াজিব হওয়া এবং তওবা শব্দ দ্বারা একথা বোঝা যায়। উপরোক্ত তিন প্রকার হত্যার যে স্বরূপ বর্ণিত হল, তা পার্থিব

বিধানের দিক দিয়ে। গোনাহ্‌র দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। শাস্তিবাণীও এরই উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। এদিক দিয়ে প্রথম প্রকার অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছাকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

০ রক্ত-বিনিময়ের উপরোক্ত পরিমাণ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন নিহত ব্যক্তি পুরুষ হবে। পক্ষান্তরে মহিলা হলে এর পরিমাণ হবে অর্ধেক। ---(হেদায়া)

০ মুসলমান ও যিম্মীর রক্ত-বিনিময় সমান। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

دية كل ذى عهد فى عهده الف دينار (হেদায়া, আবূ-দাউদ)

০ কাফ্‌ফারা অর্থাৎ ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোযা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্ত-বিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের যিম্মায় ওয়াজিব। শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে 'আকেলা' বলা হয়।--(বয়ানুল -কোরআন)

এখানে প্রশ্ন করা উচিত হবে না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর কেন চাপানো হয়? তারা তো নিরপরাধ! এর কারণ এই যে, হত্যাকারীর স্বজন-রাও দোষী। তারা তাকে এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল কাজকর্মে বাধা দেয়নি। রক্ত-বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা করতে ত্রুটি করবে না।

০ কাফ্‌ফারায় বাঁদী ও ক্রীতদাস সমান। رقبة শব্দে উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। তবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হতে হবে।

০ নিহত ব্যক্তির রক্ত-বিনিময় তার ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। কোন ওয়ারিস স্বীয় অংশ মাফ করে দিলে সেই পরিমাণ মাফ হয়ে যাবে। সবাই মাফ করে দিলে সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাবে।

০ যে নিহত ব্যক্তির কোন ওয়ারিস নেই, তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল-মাল তথা সরকারী ধনাগারে জমা হবে। কেননা, রক্ত-বিনিময় ত্যাজ্য সম্পত্তি। ত্যাজ্য সম্পত্তির বিধান তাই।---(বয়ানুল-কোরআন)

চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় (যিম্মী অথবা অভয়প্রাপ্ত)-এর ক্ষেত্রে যে রক্ত-বিনিময় ওয়াজিব হয়, বাহ্যত তা তখনই হয়, যখন যিম্মী কিংবা অভয়প্রাপ্তের পরিবার -পরিজন বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে যদি তার পরিবার-পরিজন বিদ্যমান না থাকে কিংবা তারা অমুসলমান হয়; মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হতে পারে না বলে এরূপ পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকা, না থাকারই শামিল---এমত ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি যিম্মী হলে তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল মালে জমা হবে। কেননা, যিম্মী বে-ওয়ারিসের ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ত-বিনিময়সহ বায়তুল মালে যায়। (দুররে মুখতার) নিহত ব্যক্তি যিম্মী না হলে রক্ত বিনিময় ওয়াজিব হবে না।---(বয়ানুল-কোরআন)

০ কাফ্‌ফারার রোযায় যদি রোগ-ব্যাধির কারণে উপর্যুপরিতা ক্ষুণ্ন হয় তবে প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে। অবশ্য মহিলাদের ঋতুস্রাবের কারণে যে রোযা ভাংতে হয় তাতে উপর্যুপরিতা ক্ষুণ্ন হবে না।

○ ওযরবশত রোযা রাখতে সক্ষম না হলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তওবা করবে।

○ ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কাফ্ফারা নেই---তওবা করা উচিত।---(বয়ানুল কোরআন)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا
وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۡ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۭ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ
فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝۹۴
لَا يَسْتَوِي الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِي الضَّرَرِ وَ
الْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۭ فَضَّلَ اللّٰهُ
الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۭ
وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۭ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ
اَجْرًا عَظِيْمًا ۝۹۵ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَكَانَ اللّٰهُ
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝۹۶

(৯৪) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও। তোমাদের পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুত আল্লাহ্‌র কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো এমনি ছিলে ইতিপূর্বে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্মের খবর রাখেন। (৯৫) গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান—যাদের কোন সঙ্গত ওযর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে—সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ্ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ্ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ্ মুজাহিদীনকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। (৯৬) এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহ্‌র পথে (জিহাদের জন্য) সফর কর, তখন প্রত্যেকটি কাজ (হত্যা কিংবা অন্য কিছু) খুব যাচাই করে করবে এবং যে ব্যক্তি তোমাদের সামনে আনুগত্য (অর্থাৎ আনুগত্যের লক্ষণ) প্রকাশ করে, (যেমন, কলেমা পাঠ করে অথবা মুসলমানদের নিয়মে সালাম করে) তাকে বলো না যে, তুমি (আন্তরিকভাবে) মুসলমান নও (শুধু জীবন রক্ষার জন্যই মিছামিছি ইসলাম জাহির করছ)। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ কামনা করছ। বস্তুত আল্লাহ্‌র কাছে (অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান ও সামর্থ্যের মধ্যে তোমাদের জন্য) অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আছে (যা তোমরা বৈধ পন্থায় লাভ করবে। মনে রেখ) পূর্বে (এক সময়) তোমরাও এমনি ছিলে (তোমাদের ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা একমাত্র তোমাদের দাবীর উপরই নির্ভরশীল ছিল)। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন (অর্থাৎ বাহ্যিক ইসলামকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং আন্তরিক বিষয় অনুসন্ধানের উপর ইসলামকে নির্ভরশীল রাখা হয়নি) অতএব (কিছু) চিন্তা (তো) কর! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন (যে, এ নির্দেশের পর কে তা পালন করে এবং কে করে না। যে মুসলমান বিনা ওযরে জিহাদে না গিয়ে ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় জানমাল দ্বারা (অর্থাৎ মাল ব্যয় করে এবং জানকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত করে) জিহাদ করে, তারা সমান নয়; (বরং) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পদমর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করেছেন, যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, ঐসব লোকের চাইতে, যারা ঘরে বসে থাকে। অবশ্য (ফরযে-আইন না হওয়ার কারণে গৃহে উপবিষ্টদেরও গুনাহ নেই; বরং ঈমান ও অন্যান্য ফরযে আইন পালন করার কারণে) সবার সাথে (অর্থাৎ জিহাদকারীদের সাথেও এবং উপবিষ্টদের সাথেও) আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম গৃহের (অর্থাৎ পরকালে জান্নাতের) ওয়াদা করেছেন। (জিহাদকারীদের পদমর্যাদা বেশী'---পূর্বোল্লিখিত এ কথার তাৎপর্য এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা (পূর্বোল্লিখিত) জিহাদকারীদের উপবিষ্টদের তুলনায় মহান প্রতিদানে গৌরবান্বিত করেছেন। (সে পদমর্যাদা হচ্ছে মহান প্রতিদান। এখন এর ব্যাখ্যা করা হচ্ছে) অর্থাৎ (মুজাহিদ কৃত অনেক কাজকর্মের কারণে সওয়াবের) অনেক মর্যাদা, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পাবে এবং (পাপের) ক্ষমা ও করুণা---(এগুলো হচ্ছে পদমর্যাদার বিবরণ) এবং আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল, করুণাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ঈমানদার ব্যক্তির হত্যার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হচ্ছে যে, শরীয়তের বিধানাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ইসলামই বিশ্বাসী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যে কেউ ইসলাম প্রকাশ করে, তাকে হত্যা করা থেকে নিবৃত থাকা ওয়াজিব। শুধু সন্দেহবশত আন্তরিক অবস্থা যাচাই করা এবং ইসলামী বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিশ্চিত বিশ্বাসী হওয়ার প্রমাণের অপেক্ষা করা বৈধ নয়। উদাহরণত কয়েকটি যুদ্ধে কোন

কোন সাহাবী থেকে এ জাতীয় ভুল সংঘটিত হয়েছে। মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়ার পরও কোন কোন সাহাবী ইসলামী লক্ষণাদিকে মিথ্যা মনে করে পরিচয়দানকারীকে হত্যা করেছেন এবং তার অর্থ-সম্পদ হস্তগত করেছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা এ ভ্রান্ত পদ্ধতির দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন। সাহাবীরা তখন পর্যন্ত এ মাস'আলাটি পরিষ্কাররূপে জানতেন না। তাই শুধু আদেশদানকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং এ কর্মের জন্য তাদের প্রতি কোনরূপ শাস্তিবাণী অবতীর্ণ হয়নি।---(বয়ানুল-কোরআন)

মুসলমান মনে করার জন্য ইসলামী লক্ষণাদিই যথেষ্ট ঃ উল্লিখিত তিনটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কেউ মুসলমান বলে নিজেকে পরিচয় দিলে অনুসন্ধান ব্যতিরেকে তার উক্তিকে কপটতা মনে করা কোন মুসলমানের জন্যই বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কোন কোন সাহাবী থেকে ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

তিরমিযী ও মসনদে-আহমদ গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী-সুলায়মের এক ব্যক্তি একদিন ছাগলের পাল চরানো অবস্থায় একদল মুজাহিদ সাহাবীর সম্মুখে পতিত হয়। সে মুজাহিদ দলকে সালাম করল। তার পক্ষ থেকে এ বিষয়ের কার্যত অভিব্যক্তি ছিল যে, সে একজন মুসলমান। কিন্তু মুজাহিদরা মনে করলেন যে, সে শুধু জীবন ও ছাগলের পাল রক্ষা করার জন্যই এ প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। এ সন্দেহে তারা লোকটিকে হত্যা করে তার ছাগলের পাল অধিকার করে নিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত করলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইসলামী পদ্ধতিতে তোমাকে সালাম করে, তার সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করো না যে, সে প্রতারণাপূর্বক নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে। তার অর্থ-সম্পদকে যুদ্ধলব্ধ মাল মনে করে অধিকারে নিও না।---(ইবনে-কাসীর)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আরও একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। রেওয়ায়েতটি বুখারী সংক্ষেপে এবং বায্ যার বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) একদল মুজাহিদ প্রেরণ করেন। তাঁদের মধ্যে মিকদাদ ইবনে আসওয়াদও ছিলেন। মুজাহিদ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছুলে প্রতিপক্ষের সবাই পলায়ন করল। শুধু এক ব্যক্তি থেকে গেল। তার কাছে অনেক ধন-সম্পদ ছিল। সে মুজাহিদ দলকে দেখে أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ উচ্চারণ করল। কিন্তু হযরত মিকদাদ মনে করলেন, সে প্রাণ ও ধন-সম্পদ রক্ষা করার উদ্দেশে কালেমা পাঠ করছে। অতঃপর তিনি তাকে হত্যা করলেন। অপর একজন মুজাহিদ বললেন ঃ আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র সাক্ষ্য দানকারী ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্যায় করেছেন। মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করব। রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি মিকদাদকে ডেকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করে বললেন ঃ কিয়ামতের দিন যখন কালেমা লা-ইলাহা

ইল্লাল্লাহ্ তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী হবে, তখন তুমি কি জওয়াব দেবে ? এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই لَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এ দু'টি ঘটনা ছাড়া আরও ঘটনাবলী বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সুবিজ্ঞ তফসীরবিদগণ বলেছেন, এসব রেওয়ায়েতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। সমষ্টি-গতভাবে কয়েকটি ঘটনাও আয়াতটি অবতরণের হেতু হতে পারে।

أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ—এতে سلام শব্দ দ্বারা পারিভাষিক 'সালাম' বোঝানো হলে প্রথমোক্ত ঘটনাটি আয়াতের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল হয়। পক্ষান্তরে سلام -এর শাব্দিক অর্থ শান্তি ও আনুগত্য নেওয়া হলে সব ঘটনার জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ এখানে সালামের অর্থ করেছেন আনুগত্য।

ঘটনা তদন্ত না করে সিদ্ধান্ত নেওয়া বৈধ নয় ঃ আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে একটি সাধারণ নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলমানরা কোন কাজ সত্যাসত্য যাচাই না করে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে করবে না। বলা হয়েছে ঃ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ---অর্থাৎ তোমরা যখন আল্লাহ্র পথে সফর কর, তখন সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে সব কাজ করো। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সফরে সংঘটিত হয়েছিল বলে আয়াতে সফর উল্লেখ করা হয়েছে। কিংবা এর কারণ এও হতে পারে যে, সাধারণত সফরে থাকা অবস্থায় অন্যের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়। নিজ শহরে অন্যের অবস্থা সাধারণত জানা থাকে। নতুবা আসল নির্দেশটি ব্যাপক ; অর্থাৎ সফরে হোক কিংবা বাসস্থানে হোক, সর্বত্রই খোঁজ-খবর না নিয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা বৈধ নয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ভেবে-চিন্তে কাজ করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং তড়ি-ঘড়ি কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে।---(বাহরে-মুহীত)

জাগতিক ধন-সম্পদ তথা গনীমতের মাল অর্জনের কল্পনা মুসলমানদের উপরোক্ত ভ্রান্ত পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দ্বিতীয়ত تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا বাক্যে এ রোগেরই প্রতিকার করা হয়েছে। এরপর আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যুদ্ধলব্ধ অনেক ধন-সম্পদ অবধারিত করে রেখেছেন। অতএব, তোমরা ধন-সম্পদের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ো না। অতঃপর আরও হুঁশিয়ার করা হয়েছে, তোমাদের চিন্তা করা উচিত যে, তোমাদের অনেকেই পূর্বে মক্কায় স্বীয় ঈমান ও ইসলাম প্রকাশ করতে পারতে না। এরপর আল্লাহ্ অনুগ্রহপূর্বক তোমাদের কাফিরদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন। ফলে তোমরা ইসলাম প্রকাশ করতে পেরেছ। অতএব, এটা কি সম্ভব নয় যে,

মুসলিম যোদ্ধাদল দেখে যে ব্যক্তি কলেমা পাঠ করে, সে পূর্ব থেকেই মুসলমান ছিল, কিন্তু কাফিরদের ভয়ে ইসলাম প্রকাশ করতে পারছিল না ; এখন ইসলামী বাহিনী দেখে ইসলাম প্রকাশ করেছে? অথবা শুরুতে যখন তোমরা কলেমা পাঠ করে নিজেকে মুসলমান বলেছিলে, তখন তো শরীয়ত এ নির্দেশ দেয়নি যে, তোমাদের অন্তরের অবস্থা খুঁজে দেখতে হবে, অন্তরে ইসলামের প্রমাণ পাওয়া গেলেই তোমাদের মুসলমান সাব্যস্ত করা হবে। বরং তখন কলেমা পাঠ করাকেই তোমাদের মুসলমান সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল। এমনিভাবে যে ব্যক্তি তোমাদের সামনে কলেমা পাঠ করে, তাকে মুসলমান মনে কর।

কিবলার অনুসারীকে কাফির না বলার তাৎপর্য ঃ এ আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা জানা গেল যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমানরূপে পরিচয় দেয়, কলেমা পাঠ করে কিংবা অন্য কোন ইসলামী বৈশিষ্ট্য যথা নামায, আযান ইত্যাদিতে যোগদান করে, তাকে মুসলমান মনে করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য। তার সাথে মুসলমানের মতই ব্যবহার করতে হবে এবং সে আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়েছে না কোন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলাম প্রকাশ করেছে, এ কথা প্রমাণ করার জন্য অপেক্ষা করা যাবে না।

এ ছাড়া এ ব্যাপারে তার কাজকর্মের উপরও উপরোক্ত নির্দেশ নির্ভরশীল হবে না। মনে কর, সে নামায পড়ে না, রোযা রাখে না এবং সর্বপ্রকার গোনাহে জড়িত, তবুও তাকে ইসলাম বহির্ভূত বলার কিংবা তার সাথে কাফিরের মত ব্যবহার করার অধিকার কারো নেই। এ কারণেই ইমাম আযম আবূ-হানীফা (র) বলেন ঃ لا نكفر اهل القبلة بذنب অর্থাৎ আমরা কেবলার অনুসারীকে কোন পাপকার্যের কারণে কাফির সাব্যস্ত করি না। কোন কোন হাদীসেও এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত আছে যে, যত গোনাহ্গার দুষ্কর্মীই হোক, কেবলার অনুসারীকে কাফির বলো না।

কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও স্মরণযোগ্য যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে, কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী তাকে কাফির বলা বা মনে করা বৈধ নয়। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কুফরের নিশ্চিত লক্ষণ এরূপ কোন কথা বা কাজ যতক্ষণ তার দ্বারা সংঘটিত না হবে, ততক্ষণ তার ইসলামের স্বীকারোক্তি বিশুদ্ধ মনে করা হবে এবং তাকে মুসলমানই বলা হবে। তার সাথে মুসলমানের মতই ব্যবহার করা হবে এবং তার আন্তরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার কারো থাকবে না।

কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার সাথে সাথে কিছু কুফরী কলেমা ও বকাবকি করে, অথবা প্রতিমাকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে কিংবা ইসলামের কোন অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশ অস্বীকার করে কিংবা কাফিরদের কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে ; যেমন গলায় পৈতা পরা ইত্যাদি, তবে তাকে সন্দেহাতীতভাবে কুফরী কাজকর্মের কারণে কাফির আখ্যা দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতের تبينوا শব্দে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। নতুবা ইহুদী ও খৃস্টান সবাই নিজেকে মু'মিন-মুসলমান বলত। মুসায়লামা কায্যাব শুধু কলেমার স্বীকারোক্তিই নয় ইসলামী বৈশিষ্ট্য, যথা নামায, আযান ইত্যাদিরও অনুগামী ছিল। আযানে 'আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর সাথে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার

রাসূলুল্লাহ্-ও উচ্চারণ করত। কিন্তু সাথে সাথে সে নিজেকেও নবী-রাসূল ও ওহীর অধিকারী বলে দাবী করত, যা কোরআন ও সুন্নাহ্র প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। এ কারণেই তাকে ধর্ম-ত্যাগী সাব্যস্ত করা হয় এবং সাহাবায়ে-কিরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে হত্যা করা হয়।

মোটামুটি মাস'আলা হল এই যে, প্রত্যেক কলেমা উচ্চারণকারী কিবলার অনুসারীকে মুসলমান মনে কর। তার অন্তরে কি আছে তা খোঁজাখুঁজি করার প্রয়োজন নেই। অন্তরের বিষয় আল্লাহ্র হাতে সমর্পণ কর। তবে ঈমান প্রকাশের সাথে সাথে ঈমান-বিরোধী কোন কাজ সংঘটিত হলে তাকে মুর্তাদ অর্থাৎ ধর্মত্যাগী মনে কর। এর জন্য শর্ত এই যে, কাজটি যে ঈমানবিরোধী, তা অকাট্য ও নিশ্চিত হতে হবে। এতে কোনরূপ দ্ব্যর্থতার অবকাশ নেই।

এতে আরও জানা গেল যে, 'কলেমা উচ্চারণকারী' ও 'কিবলার অনুসারী' এগুলো পারিভাষিক শব্দ। এগুলোর অর্থ ঐ ব্যক্তি, যে ইসলাম দাবী করার পর কোন কাফিরসুলভ কথা ও কাজে লিপ্ত হয়নি।

জিহাদ সম্পর্কিত কতিপয় বিধান ঃ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ---দ্বিতীয় এ আয়াতে জিহাদের কতিপয় বিধান বর্ণিত হয়েছে। যারা কোন-রূপ ওযর ব্যতিরেকে জিহাদে অংশগ্রহণ করে না, তারা সেসব লোকের সমান হতে পারে না, যারা আল্লাহ্র পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে। আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদদের অমুজাহিদদের উপর পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদ ও অমুজাহিদ—উভয় পক্ষের কাছে উত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করে-ছেন। জান্নাত ও মাগফিরাত উভয় পক্ষই লাভ করবে। তবে পদমর্যাদার পার্থক্য থাকবে।

তফসীরবিদরা বলেন ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সাধারণ অবস্থায় জিহাদ করা ফরযে-কিফায়া। কিছু লোক এ ফরয আদায় করলে অবশিষ্ট সমস্ত মুসলমান দায়িত্ব-মুক্ত হয়ে যায়। তবে শর্ত এই যে, যারা জিহাদে লিপ্ত আছে, তারা সে জিহাদের জন্য যথেষ্ট হতে হবে। যদি যথেষ্ট না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের উপর তাদের সাহায্য করা ফরযে-আইন হয়ে যাবে।

ফরযে-কেফায়ার সংজ্ঞা ঃ শরীয়তের পরিভাষায় এমন ফরযকে ফরযে-কিফায়া বলা হয়, যা আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী নয় ; বরং কিছু মুসলমান আদায় করলেই যথেষ্ট। সাধারণত জাতীয় ও সংঘবদ্ধ কর্তব্যসমূহ এ পর্যায়ভুক্ত। ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষাদান ও প্রচার এমনি একটি ফরয। কিছু সংখ্যক মুসলমান এ কাজে আত্মনিয়োগ করলে এবং তারা যথেষ্ট বিবেচিত হলে অন্যান্য মুসলমান দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কেউ আত্মনিয়োগ না করলে সবাই গোনাহ্গার হবে।

জানাযা এবং কাফন পরানোও একটি জাতীয় দায়িত্ব। এতে এক ভাই অপর

মুসলমান ভাইয়ের হক আদায় করে। মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করা এবং অন্যান্য জনহিতকর কাজ করাও ফরযে-কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। কিছু সংখ্যক লোক এসব কাজে আত্মনিয়োগ করলে অবশিষ্টরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়।

সাধারণত যেসব বিধান দলীয় ও জাতীয় প্রয়োজনাদির সাথে সম্পৃক্ত, শরীয়ত সেগুলোকে ফরযে-কিফায়াই সাব্যস্ত করেছে---যাতে কর্ম বন্টন পদ্ধতিতে সকল কর্তব্য সমাধা হতে পারে। কিছু লোক জিহাদের কর্তব্য পালন করবে, কিছু শিক্ষা ও প্রচার কাজ করবে এবং কিছু অন্যান্য ইসলামী ও মানবিক প্রয়োজনাদি সম্পাদন করবে।

আয়াতে كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى বলে যারা জিহাদ ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকে, তাদেরকেও আশ্বস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ বিধান সাধারণ অবস্থার জন্য ; যখন কিছু সংখ্যক লোকের জিহাদ শত্রুদেরকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হয়। যদি তাদের জিহাদ যথেষ্ট না হয়, সাহায্যকারী সৈন্যের প্রয়োজন হয়, তবে প্রথমে পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে-আইনে পরিণত হয়ে যায়। তারাও যথেষ্ট না হলে তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের উপর ফরযে-আইন হয়ে যায়। যদি তারাও যথেষ্ট না হয়, তবে অন্যান্য মুসলমান এমন কি, পূর্ব ও পশ্চিমের প্রত্যেকটি মুসলমানের উপর জিহাদে অংশ-গ্রহণ করা ফরযে-আইন হয়ে যায়।

তৃতীয় আয়াতেও শ্রেষ্ঠত্বের স্তর বর্ণিত হয়েছে, যা মুজাহিদরা অমুজাহিদদের উপর লাভ করেন।

খোঁড়া, পঙ্গু, অন্ধ, রোগী এবং যাদের শরীয়তসম্মত ওযর রয়েছে, তাদের উপর জিহাদ ফরয নয়।

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ
قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ
وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولٰٓئِكَ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ
مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ
لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَّلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولٰٓئِكَ عَسَى
اللّٰهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ وَمَن يُهَاجِرْ
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝١٠٠ ع

(৯৭) যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে ঃ এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে ঃ আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। (৯৮) কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না। (৯৯) অতএব আশা করা যায়, আল্লাহ্‌ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্‌ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (১০০) যে কেউ আল্লাহ্‌র পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহ্‌র কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয়ই ফেরেশতারা এমন লোকদের প্রাণ হরণ করেন, যারা (হিজরতের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত বর্জন করে) নিজেদেরকে গোনাহ্‌গার করেছিল। (তখন) তারা (ফেরেশতারা) তাদেরকে বলে ঃ তোমরা (ধর্মের) কি (কি) কাজে (নিয়োজিত) ছিলে? (অর্থাৎ ধর্মের কি কি জরুরী কাজ করছিলে?) তারা (উত্তরে) বলে ঃ আমরা নিজেদের (বসবাসের) দেশে কেবল পরাভূত ছিলাম। (তাই ধর্মের অনেক জরুরী কাজ করতে পারতাম না। অর্থাৎ এসব ফরয কার্য না করার ব্যাপারে আমরা ক্ষমার যোগ্য ছিলাম।) তারা (ফেরেশতারা) বলে ঃ (যদি এখানে করতে না পারতে, তবে) আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না? তোমাদের দেশত্যাগ করে সেখানে (অর্থাৎ অন্য অংশে) চলে যাওয়া উচিত ছিল (সেখানে পৌঁছে ফরয কাজ করতে পারতে। এতে তারা নিরুত্তর হয়ে যাবে এবং তাদের অপরাধ প্রমাণিত হয়ে যাবে)। অতএব, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং সেটা নিকৃষ্ট স্থান। কিন্তু যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু (বাস্তবপক্ষে হিজরত করতেও) সক্ষম নয়---তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না---তাদের ব্যাপারে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্‌ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ্‌ অত্যন্ত মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। আর (যাদের জন্য হিজরত আইনসিদ্ধ, তাদের মধ্য থেকে) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে (অর্থাৎ ধর্মের জন্য) হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে চলাফেরার অনেক প্রশস্ত স্থান পাবে এবং (ধর্ম প্রকাশ করার) অনেক অবকাশ পাবে। (অতএব, এমন স্থানে পৌঁছে গেলে দুনিয়াতেও এ সফরের সাফল্য সুস্পষ্ট) আর (ঘটনাক্রমে যদি এ সাফল্য অর্জিত নাও হয়, তবুও পরকালের সাফল্যে তো কোন সন্দেহ নেই। কেননা, আমার আইন এই যে,) যে ব্যক্তি গৃহ থেকে এ নিয়তে বের হয় যে, আল্লাহ্‌ ও রসূলের (ধর্ম প্রকাশ করতে পারার মত স্থানের) দিকে হিজরত করবে; অতঃপর (লক্ষ্য

অর্জনের পূর্বে) যদি তার মৃত্যু হয়ে যায়, তবুও তার সওয়াব (যা হিজরতের জন্য প্রতিশ্রুত রয়েছে) সাব্যস্ত হয়ে যায়, (ওয়াদার কারণে তা যেন) আল্লাহ্‌র যিম্মায় (এ সফরকে যদিও তখন হিজরত বলা যায় না ; কিন্তু শুধু উত্তম নিয়তের কারণে শুরু করতেই পূর্ণ প্রতিদান দান করা হয়) এবং আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, (এ অসম্পূর্ণ হিজরতের বরকতে অনেক গোনাহ্‌ও মাফ করবেন। যেমন, হাদীসে হিজরতের ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, হিজরতের কারণে পূর্ববর্তী গোনাহ্ মাফ হয়ে যায় এবং তিনি) যথেষ্ট করুণাময় (ভাল নিয়তে কাজ আরম্ভ করতেই পূর্ণ কাজের সমান সওয়াব দান করেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হিজরতের সংজ্ঞা ঃ আলোচ্য চারটি আয়াতে হিজরতের ফযীলত, বরকত ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। অভিধানে 'হিজরত' শব্দটি 'হিজরান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অসন্তুষ্টচিত্তে কোন কিছুকে ত্যাগ করা। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় দেশত্যাগ করাকে হিজরত বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় দারুল-কুফর তথা কাফিরদের দেশ ত্যাগ করে দারুল-ইসলাম তথা মুসলমানদের দেশে গমন করার নাম হিজরত।---(রূহুল মা'আনী)

মোল্লা আলী ক্বারী মিশকাতের শরায় বলেন ঃ ধর্মীয় কারণে কোন দেশ ত্যাগ করাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত।---(মিরকাত, ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃঃ)

মুজাহির সাহাবীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ সূরা হাশরের اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন দেশের কাফিররা যদি মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার কারণে দেশ থেকে জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে বহিষ্কার করে তবে তাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত।

এ সংজ্ঞা থেকে জানা গেল, যেসব মুসলমান ভারতীয় 'দারুল-কুফরের' প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়েছে অথবা অমুসলমানরা যাদেরকে শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে বাধ্যতামূলকভাবে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে, তারা সবাই শরীয়তের দৃষ্টিতে মুহাজির। তবে যারা বাণিজ্যিক উন্নতি কিংবা চাকরির সুযোগ-সুবিধা লাভের নিয়তে দেশান্তরিত হয়েছে, তারা শরীয়তের দৃষ্টিতে মুহাজির বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াদি পরিত্যাগ করে, সে মুহাজির।

অতএব এ হাদীসেরই প্রথম বাক্য থেকে এর মর্ম ফুটে ওঠে। বলা হয়েছে ঃ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده---অর্থাৎ যার মুখ ও হাতের কষ্ট থেকে সব মুসলমান নিরাপদ থাকে, সে মুসলমান।

এর উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি অপরকে কষ্ট দেয় না, সে-ই সাচ্চা ও পাক্কা মুসলমান। এমনিভাবে সাচ্চা ও সফল মুহাজির ঐ ব্যক্তি, যে শুধু দেশত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং শরীয়ত যেসব বিষয়কে হারাম ও অবৈধ সাব্যস্ত করেছে, সেগুলোকেও পরিত্যাগ করে।

অর্থাৎ ইহ্‌রামের পোশাকের সাথে সাথে অন্তরও পরিবর্তন কর।

اپنے دل کو بھی بدل جامہ احرام کیساتھ

হিজরতের ফযীলত ঃ জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ যেমন সমগ্র কোরআন পাকে ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনি হিজরতের বর্ণনাও কোরআন পাকের অধিকাংশ সূরায় একাধিকবার বিবৃত হয়েছে। সবগুলো আয়াত একত্রিত করলে জানা যায় যে, হিজরত সম্পর্কিত আয়াত-সমূহে তিন রকমের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এক. হিজরতের ফযীলত, দুই. হিজরতের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বরকত এবং তিন. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দারুল-কুফর থেকে হিজরত না করার কারণে শাস্তিবাণী।

প্রথম বিষয়বস্তু হিজরতের ফযীলত সম্পর্কিত সূরা বাকারার এক আয়াতে রয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ-প্রার্থী। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়।

দ্বিতীয় আয়াত---সূরা তওবায় আছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ○

অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্‌র কাছে বিরাট পদমর্যাদার অধিকারী এবং তারাই সফলকাম।

তৃতীয় আয়াত---আলোচ্য সূরা নিসার ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ،

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের নিয়তে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে পথেই মৃত্যুবরণ করে তার সওয়াব আল্লাহ্র যিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে যায়।

কোন কোন রেওয়ায়েত মতে এ আয়াতটি হযরত খালেদ ইবনে হেযাম সম্পর্কে আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময় অবতীর্ণ হয়। তিনি মক্কা থেকে হিজরতের নিয়তে আবিসিনিয়ার পথে রওনা হয়ে যান। পথিমধ্যে সর্প-দংশনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মোট কথা, উপরোক্ত তিনটি আয়াতে দারুল-কুফর থেকে হিজরতে উৎসাহ দান এবং এর বিরাট ফযীলত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ الهجرة تهدم ما كان قبلها

অর্থাৎ হিজরত পূর্বকৃত সব গোনাহ্কে নিঃশেষিত করে দেয়।

হিজরতের বরকত ঃ বরকত সম্পর্কে সূরা নাহ্লের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র জন্য হিজরত করে নির্যাতিত হওয়ার পর, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা দান করব এবং পরকালের বিরাট সওয়াব তো রয়েছেই, যদি তারা বুঝত!

সূরা নিসার উল্লিখিত চার আয়াতে বলা হয়েছে وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً --অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে অনেক জায়গা ও সুযোগ-সুবিধা পাবে।

আয়াতে বর্ণিত مُرَاغَمٌ শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া। স্থানান্তরিত হওয়ার জায়গাকেও অনেক সময় مراغما বলে দেওয়া হয়।

এ আয়াতদ্বয়ে হিজরতের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বরকত বর্ণিত হয়েছে। এতে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের জন্য হিজরত করে, আল্লাহ্ তার জন্য দুনিয়াতে অনেক পথ খুলে দেন। সে দুনিয়াতেও উত্তম অবস্থান লাভ করে এবং পরকালের সওয়াব ও পদমর্যাদা তো কল্পনাতীত।

'উত্তম অবস্থানের' ব্যাখ্যা মুজাহিদ (র)-এর মতে হালাল রিযিক। হাসান বসরী (র)-র মতে উত্তম গৃহ এবং অন্যান্য তফসীরবিদের মতে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রাধান্য ও

মর্যাদা লাভ। সত্যি বলতে কি, সবগুলো ব্যাখ্যাই আয়াতের মর্মভুক্ত। বিশ্ব-ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যখনই কেউ আল্লাহ্‌র জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করেছে, আল্লাহ্ তাকে স্বদেশের অবস্থান অপেক্ষা উত্তম অবস্থান, স্বদেশের সম্মানের চাইতে শ্রেষ্ঠ সম্মান এবং স্বদেশের সুখের চাইতে উৎকৃষ্ট সুখ দান করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) ইরাক ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করলে আল্লাহ্ তাঁকে উপরোক্ত সব কিছুই দান করেন। হযরত মূসা (আ) ও বনী-ইসরাঈল আল্লাহ্‌র জন্য মাতৃভূমি মিসর পরিত্যাগ করলে আল্লাহ্ তাঁকে আরও উত্তম দেশ সিরিয়া দান করেন এবং অবশেষে মিসরও তাঁরা লাভ করেন। আমাদের নয়নমণি শেষ নবী (সা) ও তাঁর সাহাবীগণ আল্লাহ্ ও রসূলের জন্য মক্কা ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁরা মক্কার চাইতে উত্তম ঠিকানা মদীনা প্রাপ্ত হন এবং সর্বপ্রকার মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেন। হিজরতের প্রথম ভাগে ক্ষণস্থায়ী দুঃখ-কষ্ট ধর্তব্য নয়। এ অন্তর্বর্তী দিনগুলোর পর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁরা যে অগণিত নিয়ামত লাভ করেন এবং কয়েক পুরুষ পর্যন্ত যা অব্যাহত থাকে তাই ধর্তব্য হবে।

সাহাবায়ে-কিরামের দারিদ্র্য ও অনাহারক্লিষ্টতার যেসব ঘটনা ইতিহাসে খ্যাত সেগুলো সাধারণত হিজরতের প্রথম ভাগের অথবা এসব ঘটনা ইচ্ছাকৃত দারিদ্র্যের। তাঁরা পার্থিব ধন-দৌলত পছন্দ করেন নি। যা অর্জিত হয়েছিল তা তাঁরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে দেন। যেমন, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজের অবস্থাও তাই ছিল। তাঁর দারিদ্র্য ও অনাহার নিছক ইচ্ছাকৃত ব্যাপার ছিল। তিনি ধনাঢ্যতা অবলম্বন করেন নি। এতদ-সত্ত্বেও ষষ্ঠ হিজরীতে খায়বর বিজয়ের পর তাঁর পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের যথেষ্ট ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। খুলাফায়ে-রাশেদীনের অবস্থাও তদ্রূপই ছিল। মদীনায় পৌঁছার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে সবকিছু দান করেছিলেন। কিন্তু ইসলামী প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) গৃহের যথাসর্বস্ব রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে উপস্থিত করে দেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নব (রা) যা ভাতা পেতেন তা ফকির-মিসকীনের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে নিজে ফকিরের মত জীবন-যাপন করতেন। এ কারণেই তিনি 'উম্মুল-মাসাকীন' তথা 'মিসকীনদের-জননী' উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও যারা বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পত্তি রেখে জান, তাঁদের সংখ্যাও সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে কম ছিল না। অনেক সাহাবী স্বদেশ মক্কায় দরিদ্র্য ও নিঃস্ব ছিলেন। হিজরতের পর আল্লাহ্ তাঁদেরকে অনেক ধন-সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ দান করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এক প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর অত্যন্ত উপভোগ্য ভঙ্গিতে নিজের পূর্ববর্তী জীবনের চিত্র অঙ্কন করতেন এবং নিজেকে সম্বোধন করে করে বলতেন ঃ তুমি তো ঐ আবূ হুরায়রাই, যে অমুক গোত্রের বিনা বেতনের চাকর ছিলে। তারা সফরে গেলে পায়ে হেঁটে তাদের সাথে চলা ছিল তোমার কাজ। তারা কোন মনযিলে অবতরণ করলে তুমি তাদের জন্য জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে আনতে। আজ ইসলামের দৌলতে তুমি কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছ। তোমাকে ইমাম ও 'আমিরুল-মু'মিনীন' বলে সম্বোধন করা হয়।

মোট কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকে মুহাজিরদের জন্য যে ওয়াদা করেছেন, জগদ্বাসী তা পূর্ণ হতে স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। তবে আলোচ্য আয়াতেই এ শর্ত

বর্ণিত হয়েছে যে, هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ অর্থাৎ হিজরত আল্লাহ্‌র পথে হওয়া উচিত। হিজরত যেন পার্থিব ধন-সম্পদ, রাজত্ব, সম্মান অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্বেষায় না হয়। বুখারীর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও রসূলের জন্যই হয় অর্থাৎ এটি বিশুদ্ধ হিজরত। এর ফযীলত ও বরকত কোরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অর্থের অন্বেষণে কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরতের বিনিময় ঐ বস্তুই, যার জন্য সে হিজরত করে।"

আজকাল কিছুসংখ্যক মুহাজিরকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখা যায়। হয় তারা এখনও অন্তর্বর্তীকালে অবস্থান করছে অর্থাৎ হিজরতের প্রাথমিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, না হয় তারা সঠিক অর্থে মুহাজির নয়। স্বীয় নিয়ত ও অবস্থা সংশোধনের প্রতি তাদের মনোনিবেশ করা উচিত। নিয়ত ও আমল সংশোধন করার পর তারা আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদার সত্যতা স্বচক্ষে দেখতে পারবে।

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
الصَّلٰوةِ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا
لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿١٠١﴾ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ
فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۖ فَإِذَا سَجَدُوا
فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ۖ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا
فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ
مَيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ
مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضٰى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ
إِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٠٢﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ

فَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ ۚ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾
وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ
كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

(১০১) যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১০২) যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সিজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা নামায পড়েনি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফিররা চায় যে, তোমরা কোনরূপে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোন গোনাহ্ নেই এবং সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (১০৩) অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (১০৪) তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত, তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহ্র কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তোমরা দেশের বুকে সফর কর (এবং তার দূরত্বের পরিমাণ হয় তিন মনযিল) তখন এ ব্যাপারে তোমাদের কোন গোনাহ্ হবে না (বরং জরুরী হবে) যে, (তোমরা যোহর, আসর ও এশার ফরয) নামায (এর রাকআতসমূহ)-কে সংক্ষেপে করে দেবে (অর্থাৎ চার রাকআতের স্থলে দু'রাকআত পড়বে,) যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে বিব্রত করবে (এবং এ আশংকায় এক জায়গায় বেশীক্ষণ অবস্থান করা অসমীচীন মনে করা হয়। কেননা,) কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। এবং যখন আপনি তাদের মধ্যে

থাকেন (এমনিভাবে আপনার অবর্তমানে যখন ইমাম তাদের মধ্যে থাকবে) অতঃপর আপনি তাদেরকে নামায পড়াতে চান, (আশংকা থাকে যে, সবাই একত্রে নামাযে রত হলে শত্রুরা সুযোগ পেয়ে আক্রমণ করে বসবে) তখন (এমতাবস্থায়) যেন (গোটা দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। অতঃপর) তাদের একভাগ আপনার সাথে (নামাযে) দণ্ডায়মান হয় (এবং অপরভাগ পাহারা দেওয়ার জন্য শত্রুদের বিপরীতে দণ্ডায়মান থাকে, যাতে শত্রুদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে পারে) এবং তারা (যারা আপনার সাথে নামাযরত, অল্প-স্বল্প) হাতিয়ার নিয়ে নেয় (অর্থাৎ নামাযের পূর্বে হাতিয়ার নিয়ে সঙ্গে রাখে, যাতে সংঘর্ষে প্রয়োজন দেখা দিলে অস্ত্র ধারণ করতে বিলম্ব না ঘটে। তৎক্ষণাৎ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে যদিও সংঘর্ষের কারণে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে কিন্তু গোনাহ্ হবে না।) অতঃপর যখন তারা সিজদা সম্পন্ন করে (অর্থাৎ এক রাক'আত পূর্ণ করে নেয়) তখন তারা (পাহারা দেওয়ার জন্য) যেন তোমাদের পিছনে চলে যায় (অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ ও অন্য দলের, যারা এখন নামাযে শামিল হবে পরে তাদের বর্ণনা আসছে এ প্রথম ভাগ যেন তাদের সবার পেছনে চলে যায়) এবং অপর ভাগ যারা এখনও নামায পড়েনি (অর্থাৎ শুরুও করেনি, তারা প্রথম ভাগের জায়গায় ইমামের কাছে) যেন আসে এবং আপনার সাথে নামায (এর অবশিষ্ট এক রাক-আত) পড়ে নেয় এবং তারাও যেন আত্মরক্ষার সরঞ্জাম ও স্ব স্ব অস্ত্র নিয়ে নেয়। (সরঞ্জাম ও অস্ত্র সঙ্গে নেওয়ার নির্দেশ দানের কারণ এই যে) কাফিররা ইচ্ছা করে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্র-শস্ত্র ও সরঞ্জাম থেকে (সামান্য) অসতর্ক হয়ে গেলে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে (সুতরাং এমত পরিস্থিতিতে সাবধানতা অপরিহার্য)। এবং যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের (অস্ত্র নিয়ে চলতে) কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও (এ কারণে অস্ত্রসজ্জিত হতে না পার) তবে এ ব্যাপারে (ও) কোন গোনাহ্ নেই যে, অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং (এর পরও) স্বীয় আত্মরক্ষার অস্ত্র (অবশ্যই) নিয়ে নাও। (এরূপ ধারণা করো না যে, কাফির-দের শত্রুতার প্রতিকার শুধু ইহকালেই করা হয়েছে বরং পরকালে এর প্রতিকার আরও বেশী হবে। কেননা,) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অনন্তর যখন তোমরা (খওফের অর্থাৎ আতঙ্কজনক অবস্থায়) নামায সম্পন্ন কর, তখন (নিয়মিত) আল্লাহ্র স্মরণে লেগে যাও দণ্ডায়মান অবস্থায়ও, উপবিষ্ট, অবস্থায়ও এবং শায়িত অবস্থায়ও (অর্থাৎ সর্বাবস্থায়। এমন কি যুদ্ধরত অবস্থায়ও আল্লাহ্র স্মরণ অব্যাহত রাখ অন্তর দ্বারাও এবং আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ করেও। বিধান অনুসরণ করাও স্মরণের অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধে শরীয়তবিরোধী তৎপরতা থেকে বিরত থাক। মোট কথা, নামায শেষ হলেও স্মরণ শেষ হয় না। সফর কিংবা আতঙ্কাবস্থার কারণে নামায তো হালকা হয়ে যায় ; কিন্তু স্মরণ পূর্বাবস্থায়ই থাকে।) অতঃপর তোমরা যখন আশঙ্কামুক্ত হয়ে যাও অর্থাৎ সফর শেষ করে স্বগৃহে অবস্থানকারী হয়ে যাও, এমনিভাবে আতঙ্কাবস্থা দূর হওয়ার পর শঙ্কামুক্ত হয়ে যাও) তখন নামায (নির্ধারিত) নিয়মানুযায়ী পড়তে থাক। (অর্থাৎ, 'কসর' এবং নামাযের অবস্থায় চলাফেরা পরিহার করে। কেননা, সাময়িক কারণে তা জায়েয করা হয়েছিল।) নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয এবং তার সময় সীমাবদ্ধ। (সুতরাং ফরয হওয়ার কারণে আদায় করা অপরিহার্য এবং সময় সীমা-বদ্ধ হওয়ার কারণে সময়ের মধ্যেই আদায় করা জরুরী। এ কারণে এর আকার-আকৃতিতে

কিছু পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে ; নতুবা আসল আকার-আকৃতিই নামাযের উদ্দিষ্ট আকার-আকৃতি। অতএব, কারণ দূর হয়ে যাওয়ার পর নামাযের আসল আকার-আকৃতি সংরক্ষণ করা অপরিহার্য।) এবং সেই সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবনে সাহস হারিও না (যখন এর প্রয়োজন হয়)। যদি তোমরা (যখমের কারণে) কষ্টে থাক তবে (তাতে কি হল?) তারাও তো জর্জরিত, যেমন তোমরা ব্যথায় জর্জরিত (সুতরাং তারা তোমাদের চাইতে বেশী শক্তিশালী নয়। কাজেই ভয় কিসের?) এবং (তোমাদের মধ্যে একটি অতিরিক্ত বিষয় এই যে,) তোমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এমন বিষয়ের ভরসা রাখ যে, তারা (তার) ভরসা রাখে না। (অর্থাৎ সওয়াব। অতএব মনের শক্তিতে তোমরা বেশী এবং দৈহিক দুর্বলতায় তোমরা তাদের অনুরূপ। কাজেই তোমাদের কর্মঠ হওয়া উচিত) আল্লাহ্ তা'আলা মহা-জ্ঞানী, (কাফিররা যে দুর্বলমনা ও দুর্বলদেহ, তা তিনি জানেন), প্রজ্ঞাময়। (তোমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত বিষয়ের কোন নির্দেশ দেন নি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্বে জিহাদ ও হিজরতের আলোচনা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিহাদ ও হিজরতের জন্য সফর করতে হয় এবং এ জাতীয় সফরে শত্রুদের পক্ষ থেকে বিপদাশংকাও থাকে। তাই সফর ও আতঙ্কাবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযে প্রদত্ত বিশেষ লঘুতা ও সংক্ষিপ্ততা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হচ্ছে।

সফর ও কসরের বিধান ঃ তিন মনযিল থেকে কম দূরত্বের সফরে পূর্ণ নামায পড়া হয়।

০ সফর শেষ করে গন্তব্য স্থলে পৌঁছার পর যদি সেখানে পনর দিনের কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সে অবস্থানও সফরের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় চার রাক-আত বিশিষ্ট ফরয নামায অর্ধেক পড়তে হবে। একে শরীয়তের পরিভাষায় 'কসর' বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি একই জনপদে পনর দিন অথবা তদূর্ধ্ব সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে তা 'সাময়িক বাসস্থান' হিসাবে গণ্য হবে। এমন জায়গায় স্থায়ী বাসস্থানের মতই কসর পড়তে হবে না—পূর্ণ নামায পড়তে হবে।

০ কসর শুধু তিন ওয়াক্তের ফরয নামাযে হবে। মাগরিব, ফজর এবং সুন্নত ও বেতরের নামাযে কসর নেই।

০ পূর্ণ নামাযের স্থলে অর্ধেক পড়ার মধ্যে কারও কারও মনে এরূপ ধারণা আনাগোনা করে যে, বোধ হয় এতে নামায পূর্ণ হলো না, এটা ঠিক নয়। কারণ, কসরও শরীয়তেরই নির্দেশ। এ নির্দেশ পালনে গোনাহ্ হয় না ; বরং সওয়াব পাওয়া যায়।

০ আয়াতে وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ—বলা হয়েছে (অর্থাৎ আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন) এতে এরূপ মনে করার অবকাশ নেই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তিরোধানের পর এখন 'সালাতুল-খওফ'-এর বিধান নেই। কেননা

তখনকার অবস্থা অনুযায়ী আয়াতে এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে। নবী বিদ্যমান থাকলে ওযর ব্যতীত অন্য কেউ নামাযে ইমাম হতে পারে না। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর এখন যিনি ইমাম হবেন, তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং 'সালাতুল-খওফ' পড়াবেন। সব ফিকহ্-বিদের মতে সালাতুল খওফের বিধান এখনও অব্যাহত রয়েছে ----রহিত হয়নি।

o মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশংকার কারণে 'সালাতুল-খওফ' পড়া যেমন জায়েয, তেমনিভাবে যদি বাঘ-ভালুক কিংবা অজগর ইত্যাদির ভয় থাকে এবং নামাযের সময়ও সংকীর্ণ হয় তাহলে তখনও 'সালাতুল-খওফ' পড়া জায়েয।

o আয়াতে উভয় দলের এক এক রাক'আত পড়ার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাক'আতের নিয়ম হাদীসে উল্লিখিত রয়েছে। তা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) দু'রাক'আতের পর সালাম ফিরিয়েছেন (বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে দ্রষ্টব্য)।

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰكَ
اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ﴿١٠٥﴾ وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ
كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ ۚ
إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيْمًا ﴿١٠٧﴾ يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ
وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا يَرْضٰى
مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٨﴾ هٰٓأَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ
جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۣ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا أَوْ
يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾
وَمَنْ يَّكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ
عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا
فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَ
رَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُّضِلُّوْكَ ۚ وَمَا يُضِلُّوْنَ

إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

(১০৫) নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ্ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশ্বাস-ঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না। (১০৬) এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১০৭) যারা মনে বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে, তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না তাঁকে, যে বিশ্বাসঘাতক পাপী হয়। (১০৮) তারা মানুষের কাছে লজ্জিত এবং আল্লাহ্র কাছে লজ্জিত হয় না। তিনি তাদের সাথে রয়েছেন, যখন তারা রাতে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে, যাতে আল্লাহ্ সম্মত নন। তারা যা কিছু করে, সবই আল্লাহ্র আয়ত্তাধীন। (১০৯) শুনছ? তোমরা তাদের পক্ষ থেকে পার্থিব জীবনে বিবাদ করছ, অতঃপর কিয়ামতের দিনে তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্র সাথে কে বিবাদ করবে অথবা কে তাদের কার্যনির্বাহী হবে? (১১০) যে গোনাহ্ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল, করুণাময় পায়। (১১১) যে কেউ পাপ করে, সে নিজের পক্ষেই করে। আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (১১২) যে ব্যক্তি ভুল কিংবা গোনাহ্ করে, অতঃপর কোন নিরপরাধের উপর অপবাদ আরোপ করে সে নিজের মাথায় বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গোনাহ্। (১১৩) যদি আপনার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণা না হত, তবে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। তারা পথভ্রান্ত করতে পারে না কিন্তু নিজেদেরকেই এবং আপনার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি ঐশী গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহ্র করুণা অসীম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আমি আপনার কাছে এ গ্রন্থ প্রেরণ করেছি, (যদ্দ্বারা) আপনি বাস্তব সত্য অনুযায়ী ঐ ফয়সালা করবেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা (ওহীর মাধ্যমে) আপনাকে (প্রকৃত অবস্থা) বলে দিয়েছেন (ওহী এই যে, বাস্তবে বশীর চোর এবং তার সমর্থক বনী উবায়রাক গোত্র মিথ্যাবাদী)। এবং (যখন প্রকৃত অবস্থা জানা হয়ে গেছে, তখন) আপনি বিশ্বাস-ঘাতকদের পক্ষপাতিত্বের কথা বলবেন না। (যেমন বনী-উবায়রাকের আসল বাসনা তাই ছিল। পরবর্তী রুকূতে একথা আসছে لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ কিন্তু রসূলুল্লাহ্

(সা) তা করেন নি। স্বয়ং এ বাক্য থেকেই তাঁর এ কাজ না করাও বোঝা যায়। কেননা এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র কৃপা আপনাকে এ ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেছে। এতে বোঝা যায় যে, আপনার পক্ষ থেকে কোন ভ্রান্তি হয়নি। নিষেধ করা দ্বারা এটা জরুরী হয় না যে, অতীতে এ কাজ হয়ে গেছে; বরং নিষেধের আসল উপকারিতা হচ্ছে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে ভবিষ্যতের জন্য তা করা থেকে বিরত রাখা। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থা এবং নিষেধাজ্ঞা উভয়টির সারমর্ম হবে এই যে, যেমন এ যাবত তিনি পক্ষপাতিত্ব করেন নি, ভবিষ্যতেও করবেন না। এ ব্যবস্থা পয়গম্বরকে নিষ্পাপ রাখার জন্য। আয়াতে সবাইকে বিশ্বাসঘাতক বলা হয়েছে। অথচ বিশ্বাসঘাতক সবাই ছিল না। তবে, যারা বিশ্বাসঘাতক ছিল না, তারাও বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্য করছিল। কাজেই তারা বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেছে) এবং (মানুষের বলাবলির কারণে রসূলুল্লাহ্ (সা) বনী উবায়রাককে ধর্মপ্রাণ মনে করেছিলেন। এরূপ মনে করা গোনাহ্ নয়; কিন্তু তাঁর এতটুকু বলে দেওয়ার কারণে হক-দারদের হক ছেড়ে দেওয়ার আশংকা ছিল। বাস্তবে তাই হয়েছে। হযরত রেফাআ (রা) দাবীর ব্যাপারে চুপ হয়ে যান। কাজেই এ কাজটি অসমীচীন হয়েছে। এ জন্য এ থেকে) আপনি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন (কেননা, আপনার মর্যাদা মহান। এতটুকু বিষয়ও আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাযোগ্য) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময় এবং আপনি তাদের পক্ষ হয়ে কোন বিবাদ করবেন না (যেমন তারা তা কামনা করে) যারা (মানুষের বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষতি করে তারা পাপ ও শাস্তির দিক দিয়ে প্রকৃতপক্ষে) নিজেদেরই ক্ষতি করছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না, যে অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক (যেমন অল্প বিশ্বাসঘাতককেও পছন্দ করেন না। এখানে বশীর যে অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক, তাই ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য। তাই صيغة مبالغة-এর পদ ব্যবহার করা হয়েছে)। তারা (স্বীয় বিশ্বাসঘাতকতাকে) মানুষের কাছ থেকে তো (লজ্জিত হয়ে) গোপন করে এবং আল্লাহ্‌র কাছে লজ্জিত হয় না, অথচ তিনি (প্রত্যেক সময়ের মত) তখন (ও) তাদের সাথে রয়েছেন, যখন তারা আল্লাহ্‌র অপ্রিয় কথাবার্তায় সলা-পরামর্শ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সব কাজকর্মকে নিজের (জ্ঞানমত) বেষ্টনীর মধ্যে রাখেন। (বশীর প্রমুখের সমর্থনে মহল্লার যারা যারা একত্রিত হয়ে এসেছিল, তারা নিছক যে,) তোমরা পার্থিব জীবনে তো তাদের পক্ষ থেকে বিবাদ করেছ। অতএব (বল যে,) কে আল্লাহ্‌র সামনে কিয়ামতের দিনও তাদের পক্ষ থেকে বিবাদ করবে? অথবা কে ঐ ব্যক্তি, যে তাদের কার্য সম্পাদনকারী হবে? (অর্থাৎ কেউ মৌখিক বিতর্কও করতে পারবে না এবং কেউ মোকদ্দমা কার্যত ঠিকও করতে পারবে না)। এবং (এ বিশ্বাসঘাতকরা যদি এখনও শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তওবা করে নিত, তবে ক্ষমা পেতে পারত। কেননা, আমার আইন এই যে,) যে ব্যক্তি কোন (সংক্রামক) দুষ্কর্ম করে অথবা (শুধু) স্বীয় জীবনের ক্ষতি করে (অর্থাৎ এমন গোনাহ্ করে না, যার প্রভাব অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছে এবং) অতঃপর আল্লাহ্‌র কাছে (শরীয়তের নিয়মানুযায়ী) ক্ষমাপ্রার্থী হয়, (বান্দার প্রাপ্য পরিশোধ করা অথবা ক্ষমা করিয়ে নেওয়াও এ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত) সে আল্লাহ্ তা'আলাকে অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময় (হিসেবে) পাবে এবং (গোনাহ্‌গারদের অবশ্যই এ জন্য চেষ্টা করা উচিত। কেননা,) যে ব্যক্তি কিছু গোনাহ্‌র কাজ করে, বস্তুত সে নিজেরই জন্য করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা মহাজ্ঞানী (সবার গোনাহ্ তিনি জানেন),

প্রজ্ঞাময় (উপযুক্ত শাস্তি বিধান করেন) এবং (এ হচ্ছে নিজে গোনাহ্ করার পরিণাম। আর যে অন্যের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তার অবস্থা শোন,) যে ব্যক্তি কোন ছোট গোনাহ্ করে অথবা বড় গোনাহ্ অতঃপর (নিজে তওবা করার পরিবর্তে) তার (অর্থাৎ গোনাহ্র) অপবাদ কোন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে, সে নিজের (মাথার) উপর জঘন্য অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপ বহন করে (যেমন, বশীর করেছে। নিজে চুরি করে জনৈক সৎ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করেছে) এবং যদি (এ মোকদ্দমায়) আপনার প্রতি (হে পয়গম্বর) আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণা না হত, (যার ছায়াতলে আপনি সর্বদাই থাকেন), তবে (এ ধূর্ত লোকদের মধ্যে) একদল তো আপনাকে পথভ্রান্ত করার ইচ্ছা করে ফেলেছিল (কিন্তু আল্লাহ্র কৃপায় আপনার উপর তাদের চাতুর্যপূর্ণ কথাবার্তার কোন প্রভাব পড়েনি এবং ভবিষ্যতেও পড়বে না। তাই আল্লাহ্ বলেন) এবং তারা (কখনও আপনাকে) পথভ্রান্ত করতে পারে না, কিন্তু (উপরোক্ত ইচ্ছা দ্বারা) নিজেদেরকে (গোনাহে লিপ্ত ও আযাবের যোগ্য করে নিচ্ছে)। এবং বিন্দুমাত্রও আপনার এ ধরনের ক্ষতি করতে পারবে না। আর (ভুলক্রমে আপনার ক্ষতি করা কিরূপে সম্ভব যখন) আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি গ্রন্থ ও জ্ঞানের কথাবার্তা অবতীর্ণ করেছেন (যার এক অংশে এ ঘটনার সংবাদও দিয়েছেন) এবং আপনাকে এমন এমন (উপকারী ও উচ্চ) বিষয়াদি শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি (পূর্ব থেকে) জানতেন না। বস্তুত আপনার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অসীম করুণা রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্বে প্রকাশ্য কাফিরদের আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েক জায়গায় মুনাফিকদের সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। কেননা, কুফর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। আলোচ্য আয়াতসমূহেও কোন কোন মুনাফিকের ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কিত ঘটনাবলী সম্পর্কে বর্ণিত হচ্ছে। (বয়ানুল-কোরআন)

আয়াতের শানে নযূল ঃ আলোচ্য সাতটি আয়াত এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্ক-যুক্ত। কিন্তু কোরআনের সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী এ ব্যাপারে প্রদত্ত নির্দেশাবলী এ ঘটনার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয় ; বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতে আগমনকারী মুসলমানদের জন্য ব্যাপক। এ ছাড়া এসব নির্দেশের মধ্যে অনেক মৌলিক ও শাখাগত মাস'আলাও রয়েছে।

প্রথমে ঘটনাটি জেনে নিন। এরপর এ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী ও মাস'আলা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুন। ঘটনাটি এই ঃ মদীনায় বনী-উবায়রাক নামে একটি গোত্র বাস করত। তাদের এক ব্যক্তির নাম তিরমিযী ও হাকেমের রেওয়ায়েতে বশীর বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বগভী ও ইবনে জারীরের রেওয়ায়েতে তো'মা উল্লেখ করা হয়েছে। সে লোকটি একবার সাহাবী কাতাদাহ্ ইবনে নোমানের চাচা রেফাআ (রা)-র গৃহে সিঁধ কেটে চুরি করে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, এ লোকটি প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক ছিল। মদীনায় বসবাস করেও সে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে অবমাননাসূচক কবিতা রচনা করে অপরের নামে প্রচার করত।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, হিজরতের প্রাথমিক যুগে সাধারণ মুসলমানরা দারিদ্র্য ও অনাহারে দিনাতিপাত করতেন। তাঁদের সাধারণ খাদ্য ছিল যবের আটা কিংবা খেজুর অথবা গমের আটা। এগুলো খুব দুর্লভ ছিল এবং মদীনায় প্রায় পাওয়াই যেত না। সিরিয়া থেকে চালান এলে কেউ কেউ মেহমানদের জন্য কিংবা বিশেষ প্রয়োজনের জন্য ক্রয় করে রাখত। হযরত রেফাআ (রা) এমনিভাবে কিছু গমের আটা কিনে একটি বস্তায় রেখে দিয়েছিলেন। এ বস্তার মধ্যেই কিছু অস্ত্রশস্ত্রও রেখে একটি ছোট কক্ষে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। বশীর কিংবা তো'মা সিঁধ কেটে বস্তা বের করে নেয়। সকালে হযরত রেফাআ ব্যাপার দেখে ভ্রাতুষ্পুত্র কাতাদাহর কাছে গেলেন এবং ঘটনা বিবৃত করলেন। সবাই মিলে মহল্লায় খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। কেউ কেউ বলল, অদ্য রাতে আমরা বনী উবায়রাকের ঘরে আগুন জ্বলতে দেখেছি। মনে হয় সে খাদ্যই পাকানো হয়েছে। রহস্য ফাঁস হয়ে পড়ার সংবাদ পেয়ে বনী-উবায়রাক নিজেরাই এসে হাযির হল এবং বলল এটা লাবিদ ইবনে সহলের কাজ। আমরা তো তাকে খাঁটি মুসলমান বলেই জানতাম। খবর পেয়ে লাবীদ তরবারি কোষমুক্ত করে এলেন এবং বললেন ঃ তোমরা আমাকে চোর বলছ? শুনে নাও, চুরির রহস্য উদ্‌ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ তরবারি কোষবদ্ধ করব না।

বনী-উবায়রাক আস্তে বলল ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার নাম কেউ নেয় না। আপনার দ্বারা এ কাজ হতেও পারে না। বগভী ও ইবনে জরীরের রেওয়ায়েতে এ স্থলে বলা হয়েছে যে, বনী-উবায়রাকে জনৈক ইহুদীর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। ধূর্ততাবশত তারা আটার বস্তা সামান্য ছিঁড়ে ফেলেছিল। ফলে রেফাআর গৃহ থেকে উপরোক্ত ইহুদীর গৃহ পর্যন্ত আটার লক্ষণ পাওয়া গেল। জানাজানির পর চোরাই অস্ত্র-শস্ত্র এবং লৌহ বর্মও ইহুদীর কাছাকাছি রেখে দিল। তদন্তের সময় তার গৃহ থেকেই এগুলো বের হল। ইহুদী কসম খেয়ে বলল, ইবনে-উবায়রাক আমাকে লৌহ-বর্মটি দিয়েছে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েত ও বগভীর রেওয়ায়েতে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, বনী উবায়রাক প্রথমে দেখল যে, এটা ধোপে টিকবে না, তখন ইহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। যা হোক এখন বিষয়টি বনী-উবায়রাক ও ইহুদীর মধ্যে গিয়ে গড়ায়।

এদিকে বিভিন্ন পন্থায় হযরত কাতাদাহ ও রেফাআর প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এটি বনী-উবায়রাকেরই কীর্তি। হযরত কাতাদাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে চুরির ঘটনা এবং তদন্তক্রমে বনী-উবায়রাকের প্রতি প্রবল ধারণার কথা আলোচনা করলেন। বনী-উবায়রাক সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে রেফাআ ও কাতাদাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই তারা আমাদের নামে চুরির অপবাদ আরোপ করছে। অথচ চোরাই মাল ইহুদীর ঘর থেকে বের হয়েছে। আপনি তাদেরকে বারণ করুন, তারা যেন আমাদেরকে দোষারোপ না করে এবং ইহুদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এরও প্রবল ধারণা জন্মে যে,

এ কাজটি ইহুদীর। বনী-উবায়রাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক নয়। বগভীর রেওয়ায়েতে আছে, এমন কি, তিনি ইহুদীর উপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ করার এবং হস্ত কর্তন করার বিষয়ও স্থির করে ফেলেন।

এদিকে কাতাদাহ্ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেনঃ আপনি বিনা প্রমাণে একটি মুসলমান পরিবারকে চুরির জন্য দোষারোপ করছেন। এতে হযরত কাতাদাহ (রা) খুব দুঃখিত হলেন এবং আফসোস করে বললেন, আমার মাল গেলেও এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কোন কিছু না বলাই ভাল ছিল। এমনিভাবে হযরত রেফাআ (রা)-কেও তিনি এ ধরনের কথা বললেন। রেফাআও ধৈর্য ধারণ করলেন এবং বললেনঃ والله المستعان (আল্লাহ্ সহায়)

বেশীদিন অতিবাহিত না হতেই এ ব্যাপারে কোরআন পাকের পূর্ণ একটি রুকূ অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে ঘটনার বাস্তব রূপ তুলে ধরা হয় এবং এ জাতীয় ব্যাপারাদি সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ দান করা হয়।

কোরআন পাক বনী-উবায়রাকের চুরি ফাঁস করে দিল এবং ইহুদীকে দোষমুক্ত করে দিল। এতে বনী-উবায়রাক বাধ্য হয়ে চোরাই মাল রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে সমর্পণ করল। তিনি রেফাআকে তা প্রত্যর্পণ করলেন। রেফাআ সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র জিহাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলেন। এদিকে বনী-উবায়রাকের চুরি প্রকাশ হয়ে পড়লে বশীর ইবনে-উবায়রাক মদীনা থেকে পলায়ন করল এবং মক্কার কাফিরদের সাথে একাত্ম হয়ে গেল। সে পূর্বে মুনাফিক থাকলে এবার প্রকাশ্য কাফির এবং পূর্বে মুসলমান থাকলে এবার ধর্মত্যাগী হয়ে গেল।

তফসীর বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের পাপ বশীরকে মক্কায়ও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। যে মহিলার গৃহে সে আশ্রয় নিয়েছিল, সে ঘটনা জানতে পেরে তাকে বহিষ্কার করে দিল। এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে এক ব্যক্তির গৃহে সিঁধ কাটে এবং প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ পর্যন্ত ছিল ঘটনার বিবরণ; এবার এ সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য শুনুন।

প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চুরির ঘটনার আসল স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ আমি আপনার প্রতি কোরআন ও ওহী এজন্য অবতরণ করেছি, যাতে আপনি আল্লাহ্-প্রদত্ত জ্ঞান ও তত্ত্ব অনুযায়ী ফয়সালা করেন এবং বিশ্বাসঘাতকদের অর্থাৎ বনী-উবায়রাকের পক্ষপাতিত্ব না করেন। যদিও বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে চুরির ব্যাপারে ইহুদীর প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রবল ধারণা হওয়া কোন গোনাহ্ ছিল না, কিন্তু ছিল বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী। তাই দ্বিতীয় আয়াতে তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, পয়গম্বরগণের স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। এতটুকু ব্যাপারও তাঁর পক্ষে শোভা পায় না।

তৃতীয় (অর্থাৎ ১০৭) আয়াতে পুনরায় তাকীদ করা হয়েছে যে, আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে কোন বিতর্ক করবেন না। কেননা আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন না।

চতুর্থ (অর্থাৎ ১০৮) আয়াতে বিশ্বাসঘাতকদের জঘন্য অবস্থা ও নির্বুদ্ধিতা ব্যক্ত হয়েছে যে, তারা নিজেদের মত মানুষের কাছে তো লজ্জাবোধ করে এবং চুরি গোপন করে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে লজ্জিত হয় না, যিনি সর্বদা তাদের সাথে রয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেক কাজ নিরীক্ষণ করছেন ; বিশেষ করে এ ঘটনাটি দেখেছেন যে, তারা পরস্পর পরামর্শ করে স্থির করে যে, ইহুদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কর, রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর কাছে রেফাআ ও কাতাদাহ্‌র বিরুদ্ধে নালিশ কর এবং তাঁকে অনুরোধ কর তিনি যেন ইহুদীর বিরুদ্ধে আমাদেরকে সমর্থন করেন।

পঞ্চম (অর্থাৎ ১০৯) আয়াতে বনী-উবায়রাকের সমর্থকদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে তো তোমরা তাদের সমর্থন করলে ; কিন্তু ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। কিয়ামতে যখন আল্লাহ্‌র আদালতে মোকদ্দমার শুনানী হবে, তখন কে সমর্থন করবে ? এ আয়াতে তাদেরকে একাধারে তিরস্কার করা হয়েছে এবং পরকালের ভীতি প্রদর্শন করে স্বীয় দুষ্কর্মের জন্য তওবা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ (অর্থাৎ ১১০) আয়াতে কোরআন পাকের সাধারণ বিজ্ঞোচিত পদ্ধতি অনুযায়ী অপরাধী-পাপীদেরকে নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার করার জন্য বলা হয়েছে যে, ছোট গোনাহ্‌ হোক বা বড় গোনাহ্‌, গোনাহ্‌গার ব্যক্তি যখন আল্লাহ্‌র কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল করুণাময় পায়। এতে করে উপরোক্ত গোনাহে যারা জড়িত ছিল, তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, এখনও সময় আছে ফিরে এস। খাঁটি মনে তওবা করলে কিছুই নষ্ট হয়নি, আল্লাহ্‌ তা'আলা মাফ করবেন !

সপ্তম (অর্থাৎ ১১১) আয়াতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা এখনও যদি তওবা না করে, তাহলে তাতে আল্লাহ্‌র রসূল কিংবা মুসলমানদের কোন ক্ষতি হবে না বরং এই পাপের বোঝা তাদেরকেই বহন করতে হবে।

অষ্টম (অর্থাৎ ১১২) আয়াতে একটি সাধারণ বিধির আকারে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজে কোন অপরাধ করে তা অন্য নিরপরাধ ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, (যেমন বর্ণিত ঘটনায় বনী-উবায়রাক নিজে চুরি করে হযরত লাবীদ অথবা ইহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল) সে জঘন্য অপবাদ এবং প্রকাশ্য গোনাহ্‌র বোঝা নিজে বহন করে।

নবম (অর্থাৎ ১১৩) আয়াতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী না হলে তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করে দিত। তিনি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে সত্য ঘটনা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী। তাই কখনও তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না ; বরং নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়। আপনার বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি করতে পারে না। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার প্রতি ঐশীগ্রন্থ এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদি অবতরণ করেছেন, যা আপনি ইতিপূর্বে জানতেন না।

রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর ইজতিহাদ করার অধিকার ঃ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ... ... بِالْحَقِّ الْكِتَابَ আয়াত থেকে পাঁচটি বিষয় প্রমাণিত হয়। (এক) যেসব

বিষয় সম্পর্কে কোরআন পাকে কোন স্পষ্ট উক্তি বর্ণিত নেই, সেগুলোতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজ মতামত দ্বারা ইজতিহাদ করার অধিকার ছিল। জরুরী বিষয়াদিতে তিনি অনেক ফয়সালা স্বীয় ইজতিহাদ দ্বারাও করতেন।

(দুই) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সে ইজতিহাদই গ্রহণযোগ্য, যা কোরআন ও সুন্নাহ্র মূলনীতি থেকে গৃহীত। এ ব্যাপারে নিছক ব্যক্তিগত মতামত ও ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তের পরিভাষায় একে ইজতিহাদ বলা যায় না।

(তিন) রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইজতিহাদ অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামের ইজতিহাদের মত ছিল না, যাতে ভুল-ভ্রান্তির আশংকা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। তিনি যখন ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন ফয়সালা করতেন, তাতে কোন ভুল হয়ে গেলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সতর্ক করে ফয়সালাকে নির্ভুল ও সঠিক করিয়ে দিতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন ইজতিহাদী ফয়সালার পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যদি এ সম্পর্কে কোন হুঁশিয়ারি অবতীর্ণ না হত, তবে তাতে প্রতিভাত হত যে, ফয়সালাটি আল্লাহ্র পছন্দনীয় ও নির্ভুল হয়েছে।

(চার) রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরআন থেকে যা কিছু বুঝতেন, তা ছিল আল্লাহ্ তা'আলারই বুঝানো বিষয়। এতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ ছিল না। অন্যান্য আলিম ও মুজতাহিদের অবস্থা তেমন নয়। তাঁরা যা বুঝেন, সে সম্পর্কে একথা বলা যায় না যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে বলে দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন। এ কারণেই فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ (অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন।) তখন তিনি তাকে শাসিয়ে দিয়ে বললেন ঃ এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর, অন্য কারও নয়।

(পাঁচ) মিথ্যা মোকদ্দমা ও মিথ্যা দাবীর তদবীর করা, ওকালতি করা, সমর্থন করা ইত্যাদি সবই হারাম।

তওবার তাৎপর্য ঃ ১১০ তম আয়াত অর্থাৎ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ থেকে জানা যায় যে, সংক্রামক গোনাহ্ ও অসংক্রামক গোনাহ্, অর্থাৎ বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহ্র হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব গোনাহ্ই তওবা ও ইস্তিগফার দ্বারা মাফ হতে পারে। তবে তওবা ও ইস্তিগফারের স্বরূপ জানা জরুরী! শুধু মুখে 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' ওয়া 'আতুবু ইলাইহি' বলার নাম তওবা ও ইস্তিগফার নয়। তাই আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি সেজন্য অনুতপ্ত না হয় এবং তা পরিত্যাগ না করে কিংবা ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করতে কৃতসংকল্প না হয়, তবে শুধু মুখে মুখে 'আস্তাগফিরুল্লাহ্' বলা তওবার সাথে উপহাস করা বৈ কিছু নয়।

তওবার জন্য মোটামুটি তিনটি বিষয় জরুরী ঃ (এক) অতীত গোনাহ্‌র জন্য অনুতপ্ত হওয়া, (দুই) উপস্থিত গোনাহ্‌ অবিলম্বে ত্যাগ করা এবং (তিন) ভবিষ্যতে গোনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকতে দৃঢ় সংকল্প হওয়া। বান্দার হকের সাথে যেসব গোনাহ্‌র সম্পর্ক, সেগুলো বান্দার কাছ থেকেই মাফ করিয়ে নেওয়া কিংবা হক পরিশোধ করে দেওয়া তওবার অন্যতম শর্ত।

নিজের গোনাহ্‌র দোষ অন্যের উপর চাপানো দ্বিগুণ শাস্তির কারণ ঃ ১১২তম আয়াতে অর্থাৎ ... . وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ..... থেকে জানা যায় যে, যে লোক নিজে পাপ করে এবং অপর নিরপরাধ ব্যক্তিকে সেজন্য অভিযুক্ত করে, সে নিজ গোনাহ্‌কে দ্বিগুণ ও অত্যন্ত কঠোর করে দেয় এবং নির্মম শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। একে তো নিজের আসল গোনাহ্‌র শাস্তি, দ্বিতীয়ত অপবাদের কঠোর শাস্তি।

কোরআন ও সুন্নাহ্‌র তাৎপর্য ঃ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ... ---বাক্যে 'কিতাব'-এর সাথে 'হিকমত' শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সুন্নাহ্‌ ও শিক্ষার নাম যে হিকমত, তাও আল্লাহ্‌ তা'আলারই অবতারিত। পার্থক্য এই যে, সুন্নাহ্‌র শব্দাবলী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। এ কারণেই কোরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য কোরআন ও সুন্নাহ্‌ উভয়টিরই তথ্যসমূহ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত। তাই উভয়ের বাস্তবায়নই ওয়াজিব।

এ থেকে কোন কোন ফিকহ্‌বিদের এ উক্তির স্বরূপও জানা গেল যে, ওহী দুই প্রকার ঃ (এক) متلو যা তিলাওয়াত করা হয় এবং (দুই) غير متلو যা তিলাওয়াত করা হয় না। প্রথম প্রকার ওহী কোরআনকে বলা হয়, যার অর্থ ও শব্দাবলী উভয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। দ্বিতীয় প্রকার ওহী হাদীস তথা সুন্নাহ্‌। এর শব্দাবলী রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর এবং মর্ম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।

রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্ট জীবের চাইতে বেশী ঃ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর জ্ঞান আল্লাহ্‌ তা'আলার জ্ঞানের মত সর্বব্যাপী ছিল না ; যেমন কতক মূর্খ বলে থাকে। বরং আল্লাহ্‌ যতটুকু দান করতেন, তিনি তাই পেতেন। তবে এতে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সমগ্র সৃষ্ট জীবের জ্ঞানের চাইতে বহু বেশী।

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ
اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ
مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

(১১৪) তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয় ; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান-খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কল্পে করত তা স্বতন্ত্র। যে এ কাজ করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমি তাকে বিরাট সওয়াব দান করব। (১১৫) যে কেউ রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফিরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গম্যস্থান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সাধারণ লোকদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শে মঙ্গল (অর্থাৎ সওয়াব ও বরকত) নেই; কিন্তু যারা দান-খয়রাত কিংবা কোন সৎকাজের অথবা মানুষের পারস্পরিক সংশোধনের প্রতি উৎসাহ দান করে (এবং এ শিক্ষা ও উৎসাহ দানের ব্যবস্থা করার জন্য গোপনে সলা-পরামর্শ করে অথবা নিজেই অপরকে দান-খয়রাতের প্রতি গোপনে উৎসাহিত করে। কেননা, মাঝে মাঝে গোপনে বলাই অধিকতর উপযোগী হয়ে থাকে। এরূপ লোকদের সলা-পরামর্শে অবশ্য মঙ্গল অর্থাৎ সওয়াব ও বরকত রয়েছে) এবং যে ব্যক্তি এ কাজ করবে (অর্থাৎ এসব কাজের প্রতি উৎসাহ দেবে) আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য (নামযশ ও খ্যাতি অর্জনের জন্য নয়) আমি অতি সত্বর তাকে মহান প্রতিদানে ভূষিত করব এবং যে ব্যক্তি রসূল (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণ করবে, সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুসলমানদের (ধর্মীয়) পথ ছেড়ে অন্য পথের অনুগামী হবে (যেমন বশীর ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে ; অথচ ইসলামের সত্যতা এবং এ চুরির ঘটনায় রসূলুল্লাহ্ [সা]-এর ফয়সালার সত্যতা তার জানা ছিল ; তবুও দুর্ভাগ্য তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে) আমি তাকে (দুনিয়াতে) যা সে করতে চায়, তাই করতে দেব এবং (পরকালে) জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। সেটা নিকৃষ্টতর জায়গা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পারস্পরিক সলা-পরামর্শ ও মজলিসের উত্তম পন্থা ঃ বলা হয়েছে ঃ لَا خَيْرَ فِي

كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ ---অর্থাৎ মানুষের যেসব পারস্পরিক সলা-পরামর্শ পরকালের ভাবনা ও পরিণতির চিন্তা বিবর্জিত এবং শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক ও সাময়িক উপকার লাভের জন্য হয়ে থাকে, সেগুলোতে কোন মঙ্গল নেই।

এরপর বলা হয়েছে ঃ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ---অর্থাৎ এসব সলা-পরামর্শ ও কানাকানিতে মঙ্গলের কোন কিছু থাকলে তা হচ্ছে একে অপরকে দান-খয়রাতে উৎসাহিত করা কিংবা সৎকাজের আদেশ দেওয়া অথবা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি স্থাপনের পরামর্শ দান করা। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মানুষের যেসব কথাবার্তায় আল্লাহ্‌র যিক্‌রি কিংবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ থাকে, সেগুলো ছাড়া সব কথাবার্তাই তাদের জন্য ক্ষতিকর।

مَعْرُوف এমন কাজকে বলা হয়, যা শরীয়তে প্রশংসিত এবং যা শরীয়ত-পন্থীদের কাছে পরিচিত। এর বিপরীতে مُنْكَر ঐ কাজ, যা শরীয়তে অপছন্দনীয় এবং শরীয়তপন্থীদের কাছে অপরিচিত।

যে কোন সৎকাজের আদেশ এবং উৎসাহদান 'আমর বিল-মারূফের' অন্তর্ভুক্ত। উৎপীড়িতের সাহায্য করা, অভাবীদের ঋণ দেওয়া, পথভ্রান্তকে পথ বলে দেওয়া ইত্যাদি সৎকাজও 'আমর বিল-মারূফে'র অন্তর্ভুক্ত। সদকা এবং মানুষের পরস্পরে শান্তি স্থাপন যদিও এর অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এতদুভয়ের উপকারিতা বহু লোকের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং জাতীয় জীবন সংশোধিত হয়।

এ ছাড়া এ দুটি কাজ জনসেবার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহকে পরিব্যাপ্ত করে। (এক) সৃষ্ট জীবের উপকার করা, (দুই) মানুষকে দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করা। সদকা উপকার সাধনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা, সৃষ্ট জীবকে ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা করার সর্বপ্রধান মাধ্যম। তাই তফসীরবিদগণ বলেন ঃ এখানে সদকার অর্থ ব্যাপক। ওয়াজিব সদকা, যাকাত, নফল সদকা এবং যে কোন উপকার এর অন্তর্ভুক্ত।

সন্ধি স্থাপনের ফযীলত ঃ মানুষের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ দূর করা এবং তাদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাণী রয়েছে। তিনি বলেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজের নির্দেশ করব না, যা রোযা, নামায ও সদকার মধ্যে সর্বোত্তম ? সাহাবীরা আরয করলেন ঃ অবশ্যই বলুন ! তিনি বললেন ঃ "এ কাজ হচ্ছে দু'ব্যক্তির পারস্পরিক বিবাদ মিটিয়ে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা।"

রসূলুল্লাহ্ (সা) আরও বলেন ঃ فساد ذات البين هى الحالقة অর্থাৎ মানুষের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ মুণ্ডনকারী বিষয়। অতঃপর এর ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ এ বিবাদ মাথা মুণ্ডন করে না, বরং মানুষের ধর্মকে মুণ্ডন করে দেয়।

আয়াতের শেষভাগে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে যে, সদকা, সৎকাজে আদেশ দান এবং মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন---এসব সৎকাজ তখনই ধর্তব্য ও গ্রহণীয় হতে পারে, যখন এগুলো খাঁটিভাবে শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হবে---কোন আত্মস্বার্থ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

উম্মতের ইজমা শরীয়তের দলীল ঃ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, দু'টি বিষয় বিরাট অপরাধ এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ ঃ (এক) রসূলের বিরুদ্ধাচরণ। এটা সুস্পষ্ট যে, রসূলের বিরুদ্ধাচরণ কুফর ও বিরাট গোনাহ্। (দুই) যে কাজে সব মুসলমান একমত, তা পরিত্যাগ করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অবলম্বন করা। এতে বোঝা গেল যে, উম্মতের ইজমা একটি দলীল। অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহ্ বর্ণিত বিধি-বিধান পালন করা যেমন ওয়াজিব, তেমনি উম্মত যে বিষয়ে একমত হয়ে যায়, তা পালন করাও ওয়াজিব। এর বিরুদ্ধাচরণ করা বিরাট গোনাহ্। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ يد الله على الجماعة من شذ شذ فى النار অর্থাৎ জামাতের উপর আল্লাহ্র হাত রয়েছে। যে ব্যক্তি মুসলমানদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হবে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

হযরত ইমাম শাফেয়ীকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ উম্মতের ঐকমত্য যে দলীল, এর প্রমাণ কোরআন পাকে আছে কি? তিনি প্রমাণ জানার জন্য উপর্যুপরি তিনদিন কোরআন তিলাওয়াত করলেন। প্রত্যহ দিনে তিনবার এবং রাতে তিনবার সম্পূর্ণ খতম করতেন। অবশেষে আলোচ্য আয়াতটি তাঁর চিন্তায় জাগ্রত হয়। আলিমদের সামনে এ আয়াত বর্ণনা করলে সবাই স্বীকার করলেন যে, উম্মতের ইজমা দলীল হওয়ার জন্য এ প্রমাণ যথেষ্ট।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ
وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا ﴿١١٦﴾ إِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ
دُوْنِهٖٓ إِلَّآ إِنٰثًا ۚ وَإِنْ يَّدْعُوْنَ إِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ
وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ﴿١١٨﴾ وَّلَأُضِلَّنَّهُمْ

وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَأٰمُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۭ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ۝ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۭ وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ۝ اُولٰۗىِٕكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۡ وَلَا يَجِدُوْنَ
عَنْهَا مَحِيْصًا ۝

(১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়। (১১৭) তারা আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে, (১১৮) যার প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন। শয়তান বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব, (১১৯) তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব ; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহ্র সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহ্কে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। (১২০) সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ নয়। (১২১) তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। তারা সেখান থেকে কোথাও পালাবার জায়গা পাবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয় (শাস্তি দিয়েও) ক্ষমা করবেন না যে, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করা হবে (বরং চিরস্থায়ী শাস্তিতে পতিত রাখবেন) এবং এ ছাড়া আর যত গোনাহ্ আছে (সগীরা হোক কিংবা কবীরা) যাকে ইচ্ছা, (শাস্তি ছাড়াই) ক্ষমা করবেন। (তবে মুশরিক মুসলমান হয়ে গেলে সে মুশরিকই থাকে না। কাজেই চিরস্থায়ীও থাকবে না।) এবং (শিরক ক্ষমা না করার কারণ এই যে) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে (কাউকে) শরীক করে, সে (সত্য বিষয় থেকে) অনেক দূরের পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (সত্য বিষয় হচ্ছে তওহীদ। এটি যুক্তির দিক দিয়েও ওয়াজিব। প্রকৃত মালিক-মাওলার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই তওহীদের মৌলিক শিক্ষা। সুতরাং যে শিরক করে, সে মালিক ও স্রষ্টার অবমাননা করে। তাই এহেন কাজ শাস্তিযোগ্য হবে। অন্যান্য গোনাহ্ এরূপ নয়। সেগুলো পথভ্রষ্টতা ঠিক, কিন্তু তওহীদের পরিপন্থী কিংবা তা থেকে দূরবর্তী নয়। তাই সেগুলোকে ক্ষমাযোগ্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অন্যান্য প্রকার কুফরও শিরকের মত ক্ষমাযোগ্য নয়। কেননা, তাতেও স্রষ্টার উক্তিসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি থাকে।

সুতরাং কাফির স্রষ্টার সততা গুণ অস্বীকার করে। কোন কোন কাফির স্বয়ং স্রষ্টার অস্তিত্বকেও অস্বীকার করে, কেউ কেউ কোন গুণকে অস্বীকার করে। আবার কেউ কেউ অস্তিত্ব ও গুণ উভয়টিকেই অস্বীকার করে। তন্মধ্যে যে-কোনটিই অস্বীকার করা হোক তা তওহীদকে অস্বীকার করার শামিল এবং তওহীদ থেকে দূরে সরে যাওয়ার নামান্তর। সুতরাং কুফর ও শিরক উভয়টিই ক্ষমাযোগ্য নয়। এরপর মুশরিকদের ধর্মীয় পন্থায় তাদের নির্বুদ্ধিতা বর্ণিত হচ্ছে যে,) এরা (মুশরিকরা) আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে (একে তো) শুধু কতিপয় নারী প্রতিমার আরাধনা করে এবং (এক) শুধু শয়তানের পূজা করে, যে (আল্লাহ্র) নির্দেশের বাইরে (এবং) যাকে (নির্দেশ অমান্য করার কারণে) আল্লাহ্ স্বীয় বিশেষ রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছেন এবং যে (বিশেষ রহমত থেকে দূরবর্তী হওয়ার সময়) বলেছিলঃ (এতে তার শত্রুতা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল) আমি (পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানোর ইচ্ছা রাখি যে অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটা অংশ স্বীয় আনুগত্যের জন্য গ্রহণ করব এবং (এ অংশের বিবরণ এই যে,) আমি তাদেরকে (ধর্মীয় বিশ্বাসে) পথভ্রান্ত করব এবং আমি তাদেরকে (কল্পনায়) বৃথা আশ্বাস প্রদান করব (যদ্দরুন তারা গোনাহ্র দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং গোনাহের ক্ষতি দৃষ্টিতে থাকবে না) এবং আমি তাদেরকে (মন্দ কাজ করার) শিক্ষা দেব। ফলে তারা (প্রতিমাদের নামে) পশুর কর্ণ ছেদন করবে (এটা কুফরী কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত) এবং আমি তাদেরকে (আরও) শিক্ষা দেব। ফলে তারা আল্লাহ্র সৃজিত বস্তুসমূহের আকৃতি বিকৃত করবে (এটা পাপাচারভুক্ত কাজ। যেমন, দাড়ি মুণ্ডন করা, উল্কী করা ইত্যাদি) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে পরিত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে (অর্থাৎ আল্লাহ্র আনুগত্য করে না) সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হবে (এ ক্ষতি হচ্ছে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া)। শয়তান যাদেরকে (ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে মিথ্যা) ওয়াদা দেয় (যে, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, হিসাব-কিতাবের ঝঞ্ঝাট কোথাও নেই—) এবং কল্পনায় তাদেরকে আশ্বাস দেয় (যে, অমুক গোনাহর মধ্যে এমন মজা আছে, অমুক হারাম পন্থায় এমন অর্থাগম হয়। শয়তানী কাজকর্মের অস্তিত্ব, অসারতা এবং ক্ষতি আপনা-আপনি প্রকাশমান) এবং শয়তান তাদের সাথে শুধু মিথ্যা (প্রতারণাপূর্ণ) ওয়াদা করে। (কেননা বাস্তবে হিসাব-কিতাব সত্য। শয়তানের আশ্বাস যে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়, তা প্রকাশ পেতে দেরী হয় না।) তাদের (যারা শয়তানের পথে চলে) বাসস্থান জাহান্নাম (এটিই প্রকাশ্য ক্ষতি) এবং এ (জাহান্নাম) থেকে কোথাও তারা নিষ্কৃতির স্থান পাবে না (যে, সেখানে আশ্রয় নেবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী জিহাদের আলোচনায় যদিও সব ইসলাম-বিরোধী সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু অবস্থা বর্ণনায় এ পর্যন্ত ইহুদী ও মুনাফিকদের আলোচনা হয়েছে। বিরোধীদের মধ্যে একদল বরং সর্ববৃহৎ দল মুশরিকদের ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের ধর্মবিশ্বাসের নিন্দা ও শাস্তি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। এ স্থলে এ আলোচনাটি আরও বেশী উপযুক্ত হওয়ার কারণ এই যে, পূর্ববর্ণিত চুরির ঘটনায় এ কথাও বলা

হয়েছিল যে, সে চোরটি ছিল মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী ব্যক্তি। সুতরাং এ আলোচনা দ্বারা তার চিরস্থায়ী শাস্তিও জানা হয়ে যায়।—(বয়ানুল কোরআন)

প্রথম আয়াত অর্থাৎ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ —সূরা নিসার শুরুতে এসব শব্দেই উল্লিখিত হয়েছে। পার্থক্য এই যে, সেখানে আয়াতের শেষভাগে وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا —বর্ণিত হয়েছে এবং এখানে إِثْمًا عَظِيمًا— বলা হয়েছে। তফসীরকারদের বর্ণনা অনুযায়ী পার্থক্যের কারণ এই যে, প্রথমোক্ত আয়াতে সরাসরি আহলে-কিতাব ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল। তারা তওরাতের মাধ্যমে তওহীদের সত্যতা, শিরকের অসত্যতা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্য নবী হওয়া সম্পর্কে অবগত ছিল। এতদসত্ত্বেও তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে যায়। অতএব, তারা স্বীয় কার্য দ্বারা যেন একথা প্রকাশ করছে যে, এটাই তওরাতের শিক্ষা। তাদের এ আচরণ নিছক মিথ্যা প্রচারণা ও অপবাদ। তাই আয়াতের শেষে فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে সরাসরি মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের কাছে ইতিপূর্বে কোন ঐশী গ্রন্থও ছিল না এবং পয়গম্বরও ছিলেন না। কিন্তু তওহীদের যুক্তিগত প্রমাণাদি সুস্পষ্ট ছিল। এছাড়া স্বহস্ত নির্মিত প্রস্তরসমূহকে উপাস্য স্থির করা স্থূলবুদ্ধি লোকদের কাছেও অযৌক্তিক, মিথ্যা ও পথভ্রষ্টতা ছিল। তাই এখানে আয়াতের শেষভাগে فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا বলা হয়েছে।

শিরক ও কুফরের শাস্তি চিরস্থায়ী হওয়া ঃ এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন করে যে, কর্ম পরিমাণে শাস্তি হওয়া উচিত। মুশরিক ও কাফিররা যে শিরক ও কুফরের অপরাধ করে, তা সীমাবদ্ধ আয়ুষ্কালের মধ্যে করে। অতএব, এর শাস্তি অনন্তকাল স্থায়ী হবে কেন? উত্তর এই যে, কাফির ও মুশরিকরা কুফর ও শিরককে অপরাধই মনে করে না; বরং পুণ্যের কাজ বলে মনে করে। তাই তাদের ইচ্ছা ও সংকল্প এটাই থাকে যে, চিরকাল এ অবস্থার উপরই কায়েম থাকবে। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত যখন সে এ অবস্থার উপরই কায়েম থাকে, তখন সে নিজ সাধ্যের সীমা পর্যন্ত চিরস্থায়ী অপরাধ করে নেয়। তাই শাস্তিও চিরস্থায়ী হবে।

জুলুম ও অবিচার তিন প্রকার ঃ প্রথম প্রকার জুলুম আল্লাহ্ তা'আলা কখনও ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার জুলুম মাফ হতে পারে। তৃতীয় প্রকার জুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ্ তা'আলা না নিয়ে ছাড়বেন না।

প্রথম প্রকার জুলুম হচ্ছে শিরক, দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহ্র হকে ত্রুটি করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা।—(ইবনে-কাসীর)

শিরকের তাৎপর্য ঃ শিরকের তাৎপর্য হচ্ছে—আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সৃষ্ট বস্তুকে ইবাদত কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করা। জাহান্নামে পৌঁছে মুশরিকরা যে উক্তি করবে, কোরআন পাক তা উদ্ধৃত করেছে ঃ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ--অর্থাৎ আল্লাহ্র কসম, আমরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্ব পালনকর্তার সমতুল্য স্থির করেছিলাম।

জানা কথা যে, মুশরিকদেরও এরূপ বিশ্বাস ছিল না যে, তাদের স্বনির্মিত প্রস্তরমূর্তি বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও মালিক। তারা অন্যান্য ভুল বোঝাবুঝির কারণে এদেরকে ইবাদতে কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ্ তা'আলার সমতুল্য স্থির করে নিয়েছিল। এ শিরকই তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছে।—(ফাতহুল-মুলহিম) জানা গেল যে, স্রষ্টা, রিযিকদাতা, সর্বশক্তিমান, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ্ তা'আলার ইত্যাকার বিশেষ গুণে কোন সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করাই শিরক।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَمَنْ اَصْدَقُ
مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿١٢٢﴾ لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ
مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا
وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ
اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ
مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿١٢٥﴾ وَلِلّٰهِ مَا

فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا ﴿١٢٦﴾

(১২২) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এবং সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে উদ্যান-সমূহে প্রবিষ্ট করাব, যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তারা চিরকাল তথায় অবস্থান করবে। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সত্য সত্য। আল্লাহ্র চাইতে অধিক সত্য-বাদী কে? (১২৩) তোমাদের আশার উপরও ভিত্তি নয় এবং আহলে-কিতাবদের আশার উপরও নয়। যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ্ ছাড়া নিজের কোন সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না। (১২৪) যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না। (১২৫) যে আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে মস্তক অবনত করে, সৎকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে—যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? আল্লাহ্ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (১২৬) যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূ-মণ্ডলে আছে, সব আল্লাহ্রই। সব বস্তু আল্লাহ্র মুষ্টি-বলয়ে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে অতিসত্বর এমন উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করাব, যার (প্রাসাদসমূহের) তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ্ এ ওয়াদা করেছেন এবং আল্লাহ্র চাইতে অধিক কার কথা সত্য হবে? তোমাদের বাসনায় কাজ হয় না এবং আহলে-কিতাবদের বাসনায়ও না (যে, শুধু মুখে মুখে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবে; বরং আনুগত্যের উপর সবকিছু নির্ভরশীল। সুতরাং) যে ব্যক্তি (আনুগত্যে ত্রুটি করবে এবং) অসৎ কাজ করবে (বিশ্বাস সম্পর্কিত হোক কিংবা কর্ম সম্পর্কিত) সে তার শাস্তি প্রাপ্ত হবে (অসৎ কাজটি কুফরী ও বিশ্বাস সম্পর্কিত হলে শাস্তি চিরস্থায়ী ও নিশ্চিত হবে এবং এর চাইতে কম হলে চিরস্থায়ী শাস্তি হবে না।) এবং সে আল্লাহ্ ছাড়া না কোন বন্ধু পাবে, না কোন সাহায্যকারী (যে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তাকে রেহাই দেবে)। এবং যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করবে সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক, বিশ্বাসী হলে এরূপ লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা বিন্দু পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না (যে, তাদের কোন নেকী নষ্ট করে দেওয়া হবে)। এবং (পূর্বে যে বিশ্বাসী হওয়ার শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, এটা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং এরা শুধু ঐ সম্প্রদায় যাদের ধর্ম আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে সর্বোত্তম। বলা বাহুল্য, একমাত্র মুসলমানরাই এরূপ সম্প্রদায়। এর প্রমাণ এই যে, তাদের মধ্যে পূর্ণ আনুগত্য, আন্তরিকতা, ইবরাহিমী মিল্লাতের অনুসরণ ইত্যাদি গুণ রয়েছে।) এবং এ ব্যক্তি (অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির ধর্ম) অপেক্ষা কার ধর্ম উত্তম হবে, যে স্বীয় মস্তক আল্লাহ্র প্রতি ঝুঁকিয়ে দেয় (অর্থাৎ আনুগত্য অবলম্বন করে---শুধু বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান করে না) বরং ইবরাহীমের ধর্মের (অর্থাৎ ইসলামের) অনুসরণ করে---

যার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বক্রতা নেই এবং (ইবরাহীমের ধর্ম অবশ্যই অনুসরণযোগ্য। কেননা,) আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-কে খাঁটি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। (সুতরাং বন্ধুর ধর্মমত অনুসরণকারীও প্রিয় ও গ্রহণীয় হবে। অতএব, ইসলামী ধর্মমতই গ্রহণীয় এবং ইসলামপন্থীরাই বিশ্বাসী উপাধির প্রতীক সাব্যস্ত হল। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ইবরাহীমের অনুসরণ ত্যাগ করেছে। তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। তাই একমাত্র মুসলমানরাই শুধু বাসনার উপর ভরসা করে না, বরং আনুগত্য করে। কার্যোদ্ধার তাদেরই হবে।) এবং (আল্লাহ্ তা'আলার পুরাপুরি আনুগত্য অবশ্যই জরুরী। কেননা, তাঁর আধিপত্য, শক্তি এবং সর্বব্যাপী জ্ঞান উভয়ই পরিপূর্ণ। এগুলোই আনুগত্য জরুরী হওয়ার ভিত্তি। সেমতে) আল্লাহ্ তা'আলারই মালিকানাধীন যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে। (এ হচ্ছে আধিপত্যের পরিপূর্ণতা) এবং আল্লাহ্ সবকিছুকে (স্বীয় জ্ঞানের পরিধিতে) বেষ্টন করে আছেন (এ হচ্ছে জ্ঞানগত পরিপূর্ণতা)।

মুসলমান ও আহলে-কিতাবদের মধ্যে একটি গর্বসূচক কথোপকথন ঃ لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ—আয়াতে প্রথমে মুসলমান ও আহ্লে-কিতাবদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি কথোপকথন উল্লিখিত হয়েছে। এরপর এ কথোপকথন বিচার করে উভয় পক্ষকে বিশুদ্ধ হেদায়েতের পথ-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবশেষে আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার একটি মানদণ্ড ব্যক্ত করা হয়েছে, যা সামনে রাখলে মানুষ কখনও ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার শিকার হবে না।

হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন ঃ একবার কিছু সংখ্যক মুসলমান ও আহ্লে কিতাবের মধ্যে গর্বসূচক কথাবার্তা শুরু হলে আহলে-কিতাবরা বলল ঃ আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত। কারণ, আমাদের নবী ও আমাদের গ্রন্থ তোমাদের নবী ও তোমাদের গ্রন্থের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানরা বলল ঃ আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, আমাদের নবী সর্বশেষ নবী এবং আমাদের গ্রন্থ সর্বশেষ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী সব গ্রন্থকে রহিত করে দিয়েছে। এ কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ অর্থাৎ এ গর্ব ও অহংকার কারো জন্য শোভা পায় না। শুধু কল্পনা, বাসনা ও দাবী দ্বারা কেউ কারো চাইতে শ্রেষ্ঠ হয় না, বরং প্রত্যেকের কাজকর্মই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। কারো নবী ও গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন, যদি সে ভ্রান্ত কাজ করে, তবে সেই কাজের শাস্তি পাবে। এ শাস্তির কবল থেকে রেহাই দিতে পারে এরূপ কাউকে সে খুঁজে পাবে না।

এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে-কিরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْٓءًا يُجْزَ بِهٖ (অর্থাৎ যে কেউ কোন অসৎ কাজ

করবে, সেজন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।) আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হল, তখন আমরা খুব দুঃখিত,-চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আরয করলাম যে, এ আয়াতটি তো কোন কিছুই ছাড়েনি। সামান্য মন্দ কাজ হলেও তার সাজা দেওয়া হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ চিন্তা করো না, সাধ্যমত কাজ করে যাও। কেননা, (উল্লিখিত শাস্তি যে জাহান্নামই হবে, তা জরুরী নয়) তোমরা দুনিয়াতে যে-কোন কষ্ট অথবা বিপদাপদে পড়, তাতে তোমাদের গোনাহ্র কাফ্ফারা এবং মন্দ কাজের শাস্তি হয়ে থাকে। এমন কি, যদি কারো পায়ে কাঁটা ফোটে, তাও গোনাহ্র কাফ্ফারা বৈ নয়।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, মুসলমান দুনিয়াতে যে কোন দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-বিসুখ অথবা ভাবনা-চিন্তার সম্মুখীন হয়, তা তার গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়।

তিরমিযী ও তফসীরে ইবনে-জরীর হযরত আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁদেরকে وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ আয়াতটি শোনালেন, তখন তাঁদের যেন কোমর ভেঙে গেল। এ প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি বললেন ঃ ব্যাপার কি? হযরত সিদ্দীক (রা) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কোন মন্দ কাজ করেনি? প্রত্যেক কাজেরই যদি প্রতিফল ভোগ করতে হয়, তবে কে রক্ষা পাবে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হে আবূ বকর! আপনারা মোটেই চিন্তিত হবেন না। কেননা, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে আপনাদের গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বললেন ঃ আপনি কি অসুস্থ হন না? আপনি কি কোন দুঃখ ও বিপদে পতিত হন না? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আরয করলেন ঃ নিশ্চয় এসব বিষয়ের সম্মুখীন হই। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ ব্যস, এটাই আপনাদের সৎকাজের প্রতিফল।

আবূ দাউদ প্রমুখের বর্ণিত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র হাদীসে বলা হয়েছে, বান্দা জ্বরে কষ্ট পেলে কিংবা পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে তা তার গোনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যায়। এমন কি, যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তু এক পকেটে তালাশ করে অন্য পকেটে পায়, তবে এতটুকু কষ্টও তার গোনাহ্র কাফফারা হয়ে যায়।

মোট কথা, আলোচ্য আয়াত মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, শুধু দাবী ও বাসনায় লিপ্ত হয়ো না ; বরং কাজের চিন্তা কর। কেননা, তোমরা অমুক নবী কিংবা গ্রন্থের অনুসারী---শুধু এ বিষয় দ্বারাই তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। বরং এ গ্রন্থের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান এবং তদনুযায়ী সৎকার্য সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ۝

অর্থাৎ যে পুরুষ কিংবা মহিলা সৎকর্ম করে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সৎকর্মের প্রতিদান পুরাপুরি পাবে। এতে সামান্যও ত্রুটি হবে না। তবে শর্ত এই যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ঈমানদার হতে হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আহ্‌লে-কিতাব ও অন্য অমুসলিমরা যদি সৎকর্ম করেও, তবে তাদের ঈমান বিশুদ্ধ না হওয়ার কারণে তাদের সৎকর্ম আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় নয়। যেহেতু মুসলমানদের ঈমানও বিশুদ্ধ এবং কর্মও সৎ, তাই তারা সফলকাম এবং অন্যদের চাইতে শ্রেষ্ঠ।

আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার মাপকাঠি ঃ তৃতীয় আয়াতে শ্রেষ্ঠত্ব ও আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার একটি মাপকাঠি বর্ণিত হয়েছে। এ মাপকাঠি অনুযায়ী কে গ্রহণীয় এবং কে প্রত্যাখ্যাত তার নির্ভুল ফয়সালা হতে পারে। এ মাপকাঠির দু'টি অংশ। তন্মধ্যে যে কোন একটিতে ত্রুটি হলে যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রই ব্যর্থ হয়ে যায়। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, দুনিয়াতে যে কোন রকম পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্ততা আছে, তা এ দু' অংশের যে কোন একটিতে ত্রুটির কারণেই সৃষ্টি হয়। মুসলমান ও অমুসলমানদেরকে কিংবা স্বয়ং মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীকে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, এ দু'টি কেন্দ্রবিন্দুর মধ্য থেকে যে কোন একটি থেকে বিচ্যুতিই তাদেরকে পথভ্রষ্টতার আবর্তে নিক্ষেপ করে।

বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ○

অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির চাইতে উত্তম পথ কারো হতে পারে না, যার মধ্যে দু'টি বিষয় পাওয়া যায় ঃ (এক) أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ অর্থাৎ যে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করে। লোক দেখানো কিংবা জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নয়; বরং খাঁটিভাবে আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে।

(দুই) وَهُوَ مُحْسِنٌ অর্থাৎ যে কাজও সঠিক পন্থায় করে। ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ সঠিক পন্থায় কাজ করার অর্থ এই যে, তার কাজ নিছক স্ব-চিন্তিত পদ্ধতিতে নয়, বরং শরীয়ত-বর্ণিত পন্থায় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর শিক্ষা অনুযায়ী সম্পন্ন হয়।

এতে বোঝা গেল যে, কোন কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য দু'টিই শর্ত ঃ (এক) ইখলাস অর্থাৎ খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র জন্য করা। (দুই) কাজটি হবে সঠিক। অর্থাৎ শরীয়ত ও সুন্নাহ অনুযায়ী হবে। প্রথম শর্ত ইখলাসের সম্পর্কে মানুষের অন্তরের সাথে এবং দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ শরীয়তানুযায়ী কাজ করার সম্পর্ক মানুষের বাহ্যিক অবস্থার সাথে। কেউ এতদুভয় শর্ত পূরণ করতে পারলে তার অন্তর ও বাহ্যিক অবস্থা ঠিক হয়ে

যায়। পক্ষান্তরে কোন একটি শর্ত অনুপস্থিত হলে কাজটি বিনষ্ট হয়ে যায়। ইখলাস না থাকলে মানুষ কার্যত মুনাফিকে পরিণত হয়। আর শরীয়তের অনুবর্তিতা না থাকলে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

ইখলাস কিংবা বিশুদ্ধ কাজের অনুপস্থিতিই জাতিসমূহের পথভ্রষ্টতার কারণ ঃ বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যাবে যে, দুনিয়াতে যত-গুলো পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ও জাতি রয়েছে, তাদের কারও মধ্যে হয়তো এখলাছ নেই কিংবা কারও কাজ সঠিক নয়। সূরা ফাতেহায় 'সিরাতে-মুস্তাকীম' তথা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতদের প্রসঙ্গে এ দু' সম্প্রদায়ের কথাই مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ এবং ضَالِّينَ শব্দে বর্ণিত হয়েছে। مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ বলে ঐ সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে, ইখলাস নেই এবং ضَالِّينَ ঐ সম্প্রদায়, যাদের কাজ সঠিক নয়। প্রথম দল কু-প্রবৃত্তির শিকার এবং দ্বিতীয় দল সংশয় ও সন্দেহের শিকার।

প্রথম শর্ত অর্থাৎ ইখলাসের প্রয়োজনীয়তা ও তার অনুপস্থিতিতে কাজ ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি প্রায় সবাই জানে ও বুঝে। কিন্তু কাজের সঠিকতা অর্থাৎ শরীয়তানুযায়ী হওয়ার শর্তটির প্রতি অনেক মুসলমানও ভ্রূক্ষেপ করেন না। তারা মনে করে যে, সৎকাজ যেভাবে ইচ্ছা করে নিলেই হল। অথচ কোরআন ও সুন্নাহ পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করেছে যে, কর্মের সঠিকতা একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শিক্ষা ও তরীকা অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। এ শিক্ষা থেকে কম করা যেমন অপরাধ, এর চাইতে বেশী করাও তেমনি অপরাধ। যোহরের চার রাক'আতের স্থলে তিন রাক'আত পড়া যেমন অন্যায়, পাঁচ রাকআত পড়াও তেমনি গোনাহ্। কোন ইবাদতে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সা) যেসব শর্ত আরোপ করেছেন, তাতে নিজের পক্ষ থেকে কোন শর্ত বাড়ানো কিংবা তাঁদের বর্ণিত আকার থেকে ভিন্ন আকার অবলম্বন করা না-জায়েয ও কর্মের সঠিকতার পরিপন্থী, যদিও কর্মটি দেখতে খুব সুন্দর দেখায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) যাবতীয় বিদ'আতকে পথভ্রষ্টতা আখ্যা দিয়েছেন এবং এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে জোর তাকীদ করেছেন। বলা বাহুল্য, এগুলো এ প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। মূর্খরা এ কাজ খাঁটিভাবে আল্লাহ্ ও রসূলের সন্তুষ্টি এবং ইবাদত ও সওয়াব মনে করে সম্পাদন করে, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের এ কাজ পণ্ডশ্রম বরং গোনাহ্র কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই কোরআন পাক বারবার কর্মের সঠিকতা অর্থাৎ সুন্নত অনুসারে করতে তাকীদ করছে। সূরা মুলকে আছে لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا এখানে أَحْسَنُ عَمَلًا বলা হয়েছে أَكْثَرُ عَمَلًا বলা হয়নি। অর্থাৎ বেশী কাজ করার কথা না বলে ভাল কাজ করার কথা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, ভাল কাজ তাই, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নত অনুযায়ী হয়।

কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে কর্মের সঠিকতা ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণকে ব্যক্ত করে বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا——অর্থাৎ তাদের চেষ্টা ও কর্ম আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয়, যারা পরকালের খাঁটি নিয়ত রাখে এবং তজ্জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টাও করে। 'যথোপযুক্ত চেষ্টা' বলতে সে চেষ্টাকেই বোঝায়, যা রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এ থেকে সরে গিয়ে কম অথবা বেশী যে চেষ্টাই করা হোক, তা 'যথোপযুক্ত চেষ্টা' নয়। যথোপযুক্ত চেষ্টারই অপর নাম কর্মের সঠিকতা, যা আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

মোট কথা, আল্লাহ্‌র কাছে কোন কর্ম গ্রহণীয় হওয়ার শর্ত দু'টি। ইখলাস ও কর্মের সঠিকতা। এরই অপর নাম রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করা। তাই যারা ইখলাসসহ সঠিক কর্ম করে, তাদের কর্তব্য হচ্ছে কাজ করার পূর্বে জেনে নেওয়া যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এ কাজটি কিভাবে করেছেন এবং এ সম্পর্কে কি কি নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের যে কাজ সুন্নাহ্‌র তরিকা থেকে বিচ্যুত হবে, তা গ্রহণীয় হবে না। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-খয়রাত, যিকির, দরূদ ও সালাম সবগুলোতেই এদিকে লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কিভাবে এগুলো করেছেন এবং কিভাবে করতে বলেছেন। আয়াতের শেষে ইখলাস ও কর্মের সঠিকতার দৃষ্টান্ত হিসাবে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর কথা উল্লেখ করে তাঁকে অনুসরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ উচ্চ পদ-মর্যাদার কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তিনি যেমন উচ্চস্তরের ইখলাসবিশিষ্ট ছিলেন, তেমনি তাঁর কর্মও আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে বিশুদ্ধ ও সঠিক ছিল।

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ
لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ
وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ
إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ

خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا
يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

(১২৭) তারা আপনার কাছে নারীদের বিবাহের অনুমতি চায়। বলে দিনঃ আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে অনুমতি দেন এবং কোরআনে তোমাদেরকে যা যা পাঠ করে শোনানো হয়, তা ঐ সব পিতৃহীনা নারীদের বিধান, যাদেরকে তোমরা নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না অথচ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখ। আর অক্ষম শিশুদের বিধান এই যে, ইয়াতীমদের জন্য ইনসাফের উপর কায়েম থাক। তোমরা যা ভাল কাজ করবে, তা আল্লাহ্ জানেন। (১২৮) যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গোনাহ্ নেই। মীমাংসা উত্তম। মনের সামনে লোভ বিদ্যমান আছে। যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং খোদাভীরু হও, তবে, আল্লাহ্ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন। (১২৯) তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব সম্পূর্ণ ঝুঁকেও পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং খোদাভীরু হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১৩০) যদি উভয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ স্বীয় প্রশস্ততা দ্বারা প্রত্যেককে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন। আল্লাহ্ সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময়।

যোগসূত্র ঃ সূরার প্রারম্ভে ইয়াতীম ও মহিলাদের বিশেষ বিধান এবং তাদের অধিকার আদায় করার অপরিহার্যতার উল্লেখ ছিল। কেননা, জাহিলিয়াত যুগে কেউ কেউ তাদেরকে উত্তরাধিকারই দিত না, কেউ কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা অন্য কোন প্রকারে তারা যা পেত, তা বেমালুম হজম করে ফেলত এবং কেউ কেউ তাদেরকে বিয়ে করে পূর্ণ মোহরানা দিত না। পূর্বে এসব গর্হিত কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এতে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয়। কেউ কেউ ধারণা করতে থাকে যে, নারী ও শিশুরা আসলে উত্তরাধিকারের যোগ্য নয়। কোন সাময়িক কারণে কিছুসংখ্যক লোককে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় যে, তা রহিত হয়ে যাবে। কেউ কেউ রহিত হওয়ার অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে। অবশেষে যখন রহিত হল না, তখন পরামর্শক্রমে স্থির হল যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা উচিত। সেমতে তারা উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল। ইবনে-জরীর ও ইবনুল-মুনযিরের বর্ণনা

অনযায়ী এ প্রশ্নই হচ্ছে আয়াত অবতরণের কারণ। এর পরবর্তী আয়াতসমূহে নারীদের সম্পর্কে আরও কতিপয় মাস'আলা বর্ণনা করা হয়েছে।---(বয়ানুল-কোরআন)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তারা আপনাকে নারীদের (উত্তরাধিকার ও মোহরানার) বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে (সেই পূর্বের) নির্দেশই দিচ্ছেন এবং ঐসব আয়াত ও (তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়) যা (ইতিপূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে এবং) কোরআনে তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয় (কেননা কোরআন তিলাওয়াতের সময় এসব আয়াতের তিলাওয়াত তো হয়েই যায়) পিতৃহীনা নারীদের সম্পর্কে যাদের (সাথে তোমাদের ব্যবহার এই যে, তারা অর্থশালিনী হলে তোমরা তাদেরকে বিয়ে কর, কিন্তু তাদের)-কে (শরীয়ত) নির্ধারিত অধিকার (উত্তরাধিকার ও মোহরানা) প্রদান কর না এবং (যদি সৌন্দর্যশালিনী না হয়ে শুধু অর্থশালিনী হয়, তবে) তাদেরকে (রূপশালিনী না হওয়ার কারণে) বিয়ে করতে ঘৃণা কর (কিন্তু অর্থশালিনী হওয়ার কারণে অর্থ অন্যত্র চলে যাওয়ার আশংকায় অন্য কাউকেও বিয়ে করতে দাও না) এবং (যেসব আয়াত) অসমর্থ শিশুদের সম্পর্কে (রয়েছে) এবং (যেসব আয়াত) এ সম্পর্কে (রয়েছে) যে, ইয়াতীমদের (সব) কার্যব্যবস্থা (মোহরানা ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত হোক কিংবা অন্য কিছু) ইনসাফের সাথে কর (এ পর্যন্ত পূর্বে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু পূর্ণ বর্ণিত হল। এ সব আয়াত স্বীয় নির্দেশ এখনও তোমাদের প্রতি ওয়াজিব করছে এবং সেসব নির্দেশ হুবহু কার্যকর রয়েছে। তোমরা এসব নির্দেশ অনুযায়ী কাজ কর) এবং তোমরা যে সৎকাজ করবে (নারী ও ইয়াতীমদের সম্পর্কে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা খুব জানেন (তোমাদেরকে এর উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর তিনি সেসব বিষয়েও অবগত যা অকল্যাণকর। কিন্তু এখানে সৎকাজের প্রতি উৎসাহ দান উদ্দেশ্য; তাই বিশেষভাবে সৎকাজ উল্লেখ করা হয়েছে) এবং যদি কোন নারী (লক্ষণাদির দ্বারা) স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ (ও রূঢ়তা) কিংবা উপেক্ষার (ও বিমুখতার) প্রবল আশংকা করে, তবে এমতাবস্থায়) তারা উভয়ে পরস্পরের মধ্যে কোন বিশেষ সুমীমাংসা করে নিলে তাদের কোন গোনাহ্ নেই (অর্থাৎ স্বামী যদি স্ত্রীকে পূর্ণ অধিকার প্রদান করতে না চায় এবং অধিকারের কারণে তাকে ত্যাগ করতে চায়, তবে স্ত্রীর জন্য কিছু অধিকার ছেড়ে দেওয়া, যেমন ভরণ-পোষণ মাফ করে দেওয়া কিংবা হ্রাস করে দেওয়া কিংবা রাত্রি যাপনে স্বীয় পালা মাফ করে দেওয়া জায়েয---যাতে স্বামী তাকে ত্যাগ না করে এমনিভাবে স্ত্রীর এ ত্যাগ গ্রহণ করা স্বামীর জন্যও জায়েয) এবং (ঝগড়া-বিবাদ কিংবা বিচ্ছেদের চাইতে তো) মীমাংসা (ই) উত্তম। (এরূপ মীমাংসা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কেননা) মানব মন (স্বভাবত) প্রলোভনের সাথে সংযুক্ত (ও মিলিত) আছে। (লোভ পূর্ণ হয়ে গেলে সে রাযী হয়ে যায়। স্বামী যখন দেখবে যে, তার আর্থিক ও আত্মিক স্বাধীনতা---যার প্রতি তার স্বভাবজাত লোভ আছে ---মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় না, অথচ বিনা মাশুলে স্ত্রী পাওয়া যায়, তখন সম্ভবত সে তাকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে সম্মত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে স্ত্রীর

লোভই হল মীমাংসার আসল কারণ, তা যে কারণেই হোক না কেন। অতএব উভয় পক্ষের বিশেষ বিশেষ লোভ এ মীমাংসার পথকে প্রশস্ত করে দেবে।) এবং (হে পুরুষ-কুল) যদি তোমরা (স্বয়ং নারীদের সাথে) সদ্ব্যবহার কর (এবং তাদের কাছ থেকে অধিকার মাফ করাতে ইচ্ছুক না হও) এবং তাদের সাথে (রূঢ় ও উপেক্ষামূলক ব্যবহার থেকে) সংযমী হও, তবে (তোমরা অনেক সওয়াব পাবে। কেননা) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কাজ-কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন (এবং সৎকর্মের জন্য সওয়াব দান করেন)। আর স্বভাবত তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে (সর্বপ্রকারে) সমান ব্যবহার করতে পারবে না। (এমন কি আন্তরিক আগ্রহের ক্ষেত্রে) যদিও তোমরা (এ সমান আচরণের যতই না) আকাঙ্ক্ষী হও (এবং এ ব্যাপারে যতই না চেষ্টিত হও। কিন্তু মনের টান ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। তাই এর উপর জোর চলে না। কোথাও যদি সমান আচরণ হয়েই যায়, তবে আয়াতে তার অস্বীকার উদ্দেশ্য নয়। মোট কথা, যখন ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়, তখন তোমরা এজন্য আদিষ্ট নও। কিন্তু আচরণ ইচ্ছাধীন না হওয়াতে এটা জরুরী হয় না যে, বাহ্যিক অধিকারও ইচ্ছাধীন হবে না; বরং বাহ্যিক অধিকার প্রদান ইচ্ছাধীন ব্যাপার। এটা যখন ইচ্ছাধীন ব্যাপার), অতএব (তোমাদের অবশ্য করণীয় এই যে,) তোমরা (সম্পূর্ণরূপে অর্থ এই যে, অন্তর দ্বারাও---যাতে তোমরা স্বেচ্ছাধীন অর্থাৎ শরীয়তসম্মত অধিকারে তাদের প্রতি অসদাচরণ ও উপেক্ষা করো না) যাতে তাকে (নির্যাতিতাকে) এমন করে দাও, যেমন কেউ এদিকেও না, সেদিকেও না---(অর্থাৎ মধ্যস্থলে) দোদুল্যমান। (অর্থাৎ তাকে অধিকারও প্রদান করা হয় না যে, তাকে বিবাহিতা মনে করা যায় এবং তালাকও দেওয়া হয় না যে, স্বামীবিহীন মনে করা যায় এবং অন্যকে বিবাহ করতে পারে, বরং স্ত্রীকে বিবাহবন্ধনে রাখলে ভালরূপে রাখ) এবং (রাখলে অতীতে তার সাথে যে অপ্রিয় ব্যবহার করা হয়েছে) যদি (এসব ব্যবহার এই মুহূর্তে) সংশোধন করে নাও এবং (ভবিষ্যতে এরূপ ব্যবহার করা থেকে) সংযমী হও, তবে (অতীত বিষয়াদি ক্ষমা করা হবে। কেননা) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। (বান্দা ক্ষমা করলে বান্দার হক সম্পর্কিত গোনাহর সংশোধন হয়। সুতরাং এ ক্ষমা সংশোধন করার মধ্যেই এসে গেছে। অতএব শরীয়তের দৃষ্টিতে তওবা বৈধ হবে এবং গ্রহণীয়ও হবে) এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় (অর্থাৎ কোনরূপে বনিবনাও না হয় এবং খুলা কিংবা তালাক হয়ে যায়), তবে তাদের মধ্যে কেউ---স্বামীর অন্যায় থাকলে স্বামী এবং স্ত্রীর ত্রুটি থাকলে স্ত্রী যেন মনে না করে যে, তাকে ছাড়া অপরপক্ষে কার্যোদ্ধার হবে না। কেননা) আল্লাহ্ স্বীয় প্রশস্ততা দ্বারা (উভয়ের মধ্য থেকে) প্রত্যেককে (অপরের) অমুখাপেক্ষী করে দেবেন। (অর্থাৎ প্রত্যেকের অবধারিত কাজ অপর পক্ষকে ছাড়াই উদ্ধার হবে) এবং আল্লাহ্ সুপ্রশস্ত, প্রজ্ঞাময় (প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত পথ বের করে দেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দাম্পত্য জীবন-সম্পর্কে কতিপয় পথনির্দেশ ঃ وَاِنِ امْرَاَةٌ ... وَاسِعًا

حَكِيمًا অত্র তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের দাম্পত্য জীবনের এমন একটি জটিল দিক সম্পর্কে পথ নির্দেশ করেছেন, সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকটি দম্পতিকেই যার সম্মুখীন হতে হয়। তা হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি। আর এটি এমন একটি জটিল সমস্যা যার সুষ্ঠু সমাধান যথাসময়ে না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিসহ হয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে এহেন পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত কলহ-বিবাদ তথা হানাহানি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কোরআন পাক নর ও নারীর যাবতীয় অনুভূতি ও প্রেরণার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয় শ্রেণীকে এমন এক সার্থক জীবন-ব্যবস্থা বাতলে দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যার ফলে মানুষের পারিবারিক জীবন সুখময় হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর অনুসরণে পারস্পরিক তিক্ততা ও মর্মপীড়া ভালবাসা ও প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর যদি অনিবার্য কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়, তবে তা করা হবে সম্মানজনক ও সৌজন্যমূলক পন্থায় যেন তার পেছনে শত্রুতা, বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের মনোভাব না থাকে।

১২৮ তম আয়াতটি এমনি সমস্যা সম্পর্কিত, যাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ হিসাবে উভয়ে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক মনের মিল না হওয়ার কারণে উভয়ে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা করে। যেমন, একজন সুদর্শন সুঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা অথবা সুশ্রী না হওয়ার কারণে তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হচ্ছে না। আর এর প্রতিকার করাও স্ত্রীর সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় স্ত্রীকেও দোষারোপ করা যায় না, অন্যদিকে স্বামীকেও নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায়।

অত্র আয়াতের শানে-নযুল প্রসঙ্গে এ ধরনের কতিপয় ঘটনা তফসীরে-মাযহারী প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে কোরআন পাকের সাধারণ নীতি فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ অর্থাৎ উক্ত স্ত্রীকে বহাল রাখতে চাইলে তার যাবতীয় ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ করে রাখতে হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে কল্যাণকর ও সৌজন্যমূলক পন্থায় তাকে বিদায় করবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীও যদি বিবাহ-বিচ্ছেদে সম্মত হয়, তবে ভদ্রতা ও শালীনতার সাথেই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তার সন্তানের খাতিরে অথবা নিজের অন্য কোন আশ্রয় না থাকার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদে অসম্মত হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, নিজের প্রাপ্য মোহর বা খোরপোশের ন্যায্য দাবী আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার জন্য সম্মত করাবে। দায়-দায়িত্ব ও ব্যয়ভার লাঘব হওয়ার কারণে স্বামীও হয়ত এ সমস্ত অধিকার থেকে মুক্ত হতে পেরে এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে।

কোরআন-করীমের অত্র আয়াতে এ ধরনের সমঝোতার সম্ভাব্যতার প্রতি পথ

নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ অর্থাৎ "প্রত্যেক অন্তরেই লোভ বিদ্যমান রয়েছে।" কাজেই স্ত্রী হয়ত মনে করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরবাদ হবে অথবা অন্যত্র আমার জীবন আরো দুর্বিসহ হতে পারে। তার চেয়ে বরং এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাই লাভজনক। স্বামী হয়ত মনে করবে যে, দায়-দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহবন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি? অতএব এভাবে অনায়াসে সমঝোতা হতে পারে।

সাথে সাথে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

"যদি কোন নারী নিজ স্বামীর পক্ষ হতে কলহ-বিবাদ বা বিমুখ হওয়ার আশংকা বোধ করে, তবে উভয়ের কারোই কোন গোনাহ্ হবে না, যদি তারা নিজেদের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে পারস্পরিক সমঝোতায় উপনীত হয়। এখানে গোনাহ্ না হওয়ার কথা বলার কারণ এই যে, ব্যাপারটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘুষের আদান-প্রদানের মত মনে হয়। কারণ স্বামীকে মোহরানা ইত্যাদি ন্যায্য দাবী হতে অব্যাহতির প্রলোভন দিয়ে দাম্পত্য বন্ধন অটুট রাখা হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাকের এ ভাষ্যের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বস্তুত এটা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং উভয় পক্ষের কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমঝোতার ব্যাপার। অতএব এটা সম্পূর্ণ জায়েয।

দাম্পত্য কলহের মধ্যে অযথা অন্যের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় ঃ তফসীরে-মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কোন সমঝোতা করে নেবে। এখানে بَيْنَهُمَا শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-কলহ বা সন্ধি-সমঝোতার মধ্যে অহেতুক কোন তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলাবে না, বরং তাদের নিজেদেরকে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কারণ তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির ফলে স্বামী-স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি অন্য লোকের গোচরীভূত হয়, যা তাদের উভয়ের জন্যই লজ্জাজনক ও স্বার্থের পরিপন্থী। তদুপরি তৃতীয় পক্ষের কারণে সন্ধি-সমঝোতা দুষ্কর হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। অত্র আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

অর্থাৎ আর যদি তোমরা কল্যাণ সাধন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।" এখানে বোঝানো হয়েছে যে, অনিবার্য কারণবশত স্বামীর অন্তরে যদি স্ত্রীর প্রতি কোন আকর্ষণ না

থাকে এবং তার ন্যায্য অধিকার পূরণ করা অসম্ভব মনে করে তাকে বিদায় করতে চায়, তবে আইনের দৃষ্টিতে স্বামীকে সে অধিকার দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছুটা স্বার্থ পরিত্যাগ করে সমঝোতা করাও জায়েয। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বামী যদি সংযম ও খোদাভীতির পরিচয় দেয়, স্ত্রীর সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে, মনের মিল না হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে বরং তার যাবতীয় অধিকার ও প্রয়োজন পূরণ করে, তবে তার এই ত্যাগ ও উদারতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াকিফহাল রয়েছেন। অতএব. তিনি এহেন ধৈর্য, উদারতা, সহনশীলতা ও মহানুভবতার এমন প্রতিদান প্রদান করবেন, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এখানে "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন" বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিদান কি দেবেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এর প্রতিদান হবে কল্পনার উর্ধ্বে, ধারণার অতীত।

আলোচ্য আয়াতের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এই যে, স্বামী যদি দেখে যে, অনিবার্য কারণবশত স্ত্রীর সাথে তার মনের মিল হচ্ছে না এবং স্ত্রীও তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তবে স্ত্রীর আয়ত্তাধীন বিষয়ে যতটুকু সম্ভব তাকে সংশোধনের চেষ্টা করবে। মৌখিক সতর্কীকরণ, সাময়িক অনাসক্তি ভাব প্রদর্শন এবং প্রয়োজনবোধে সাধারণ মারধোর পর্যন্ত করবে, যেমন সূরা নিসার প্রাথমিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি সংশোধনের আশা না থাকে অথবা সমস্যার মূল কারণ দূর করা স্ত্রীর সাধ্যাতীত হয়, তবে অযথা ঝগড়া-বিবাদ না বাড়িয়ে স্ত্রীকে ভদ্রভাবে বিদায় করার শরীয়তসম্মত অধিকার স্বামীকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বামী যদি সংযম অবলম্বন করে স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে, স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করেও স্ত্রীর দাবী-দাওয়া পূরণ করে, তবে তা তার জন্য অতি উত্তম প্রশংসনীয় ও বিপুল সওয়াবের বিষয় হবে। পক্ষান্তরে ঘটনা যদি বিপরীত হয় অর্থাৎ যদি স্বামী অযথাই স্ত্রীর প্রতি বিমুখ হয় এবং তার ন্যায্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত রেখে কষ্ট দেয়, ফলে বাধ্য হয়ে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ কামনা করে। এমতাবস্থায় স্বামীও যদি তাকে অব্যাহতি দিতে প্রস্তুত হয়, তা হলে সহজেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আর যদি স্বামী স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে অব্যাহতি দিতে অসম্মত হয়, তবে শরীয়তী আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মোকদ্দমা দায়ের করে স্বামীর অবহেলা নিপীড়ন হতে নিষ্কৃতি লাভ করার অধিকার স্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্ত্রী যদি ধৈর্য ধারণ করে স্বামীর সাথে প্রীতি-সৌহার্দ বজায় রাখে, স্বীয় অধিকার উৎসর্গ করে সর্বতোভাবে স্বামীসেবায় আত্মনিয়োগ করে, তবে তার জন্য তা কল্যাণকর এবং বিপুল সওয়াবের বিষয় হবে।

মোট কথা, কোরআন পাক উভয় পক্ষকে একদিকে স্বীয় অভাব-অভিযোগ দূর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনত অধিকার দিয়েছে। অপর দিকে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ও উন্নত চরিত্র আয়ত্ত করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিবাহবিচ্ছেদ থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকা উচিত; উভয়ের পক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় আসা বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিরোধের সমঝোতার ব্যাপারে উপনীত হওয়াকে জায়েয করা হয়েছে। আয়াতের শেষ দিকে সমঝোতা না হলেও উভয়

পক্ষকে ধৈর্য ও সবর অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মাঝখানে সমঝোতাকে শ্রেয়তর, কল্যাণকর ও পছন্দনীয় বিষয় বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ اَلصُّلْحُ خَيْرٌ অর্থাৎ "সমঝোতা করা অতি উত্তম।" বাক্যটি ব্যাপক অর্থবোধক হওয়ার কারণে এর আওতায় স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ তথা দুনিয়ার যাবতীয় দ্বন্দ্ব-বিরোধই এসে গেছে অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে আপোস ও সমঝোতার পন্থাই সর্বোত্তম।

সারকথা এই যে, দুনিয়ার যে কোন বিরোধের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের নিজ নিজ স্বার্থ ও দাবীর উপর অটল থাকার পরিবর্তে আংশিক ক্ষতি স্বীকার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমঝোতা স্থাপন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। হযরত রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

كل صلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا - (رواه حاكم عن كثير بن عبد الله، تفسير مظهرى)-

অর্থাৎ মুসলমানদের পারস্পরিক যে কোন সমঝোতা ও সন্ধিচুক্তি বৈধ। তবে কোন হারামকে হালাল বা হালালকে হারাম করার চুক্তি বৈধ নয়। স্বীকৃত শর্তের উপর স্থির থাকা মুসলমানদের কর্তব্য। তবে কোন হালালকে হারাম করার শর্ত পালন করা যাবে না। ---(তফসীরে মাযহারী)

যেমন, কোন স্ত্রীর সাথে তার ভগ্নিকেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখার শর্তে আপোস করা হলে তা বৈধ হবে না। কারণ দু'বোনকে একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা হারাম। অনুরূপভাবে স্ত্রীর কোন ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ না করার শর্তে সন্ধি করা অবৈধ। কেননা এর ফলে হালালকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়।

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাপক অর্থের উপর ভিত্তি করে হযরত ইমাম আজম (র) সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে সর্বপ্রকার আদান-প্রদান জায়েয আছে—তা দাবীদারের দাবী স্বীকার করে হোক বা অস্বীকার করে হোক অথবা নীরবতা অবলম্বন করে হোক। যেমন, বাদী বিবাদীর কাছে এক হাজার টাকা দাবী করল। বিবাদীও তার সত্যতা স্বীকার করে বলল যে, বাদীকে এক হাজার টাকা পরিশোধ করা তার কর্তব্য। কিন্তু নগদ এক হাজার টাকা পরিশোধ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করল। এমতাবস্থায় বাদী কর্তৃক কিছু টাকা ক্ষমা করে বা টাকার পরিবর্তে অন্য কোন বস্তু গ্রহণ করে আপোস করা জায়েয অথবা বিবাদী কর্তৃক বাদীর দাবী স্পষ্টত স্বীকার বা অস্বীকার না করে নীরবতা অবলম্বন করা হলে কিংবা বাদীর দাবী স্পষ্টত অস্বীকার করেও যদি বলে যে, যা হোক তোমার সাথে আমি বিবাদ করতে চাই না, বরং এত টাকার বিনিময়ে তোমার সাথে আপোস করতে চাই। উপরোক্ত তিন প্রকার সন্ধিচুক্তিই বৈধ এবং অর্থের আদান-প্রদান জায়েয ও হালাল। তবে অস্বীকৃতি বা নীরবতার সাথে সন্ধির ক্ষেত্রে অন্যান্য ইমামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

পরিশেষে অত্র আয়াতে উল্লিখিত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আপোস-নিষ্পত্তি সম্পর্কিত একটি মাস'আলা সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যখন কোন মহিলা তার কোন ন্যায্য দাবী প্রত্যাহার করে স্বামীর সাথে আপোস করে যা স্বামীর দায়িত্বে ওয়াজিব ছিল—তা চুক্তির শর্ত অনুসারে চিরতরে মওকুফ হয়ে যাবে; পরবর্তীকালে তা দাবী করার কোন অধিকার তার থাকবে না। পক্ষান্তরে তার যেসব পাওনা তখনই পরিশোধ করা স্বামীর উপর ওয়াজিব ছিল না; যেমন ভবিষ্যতকালের খোরপোশ ও রাত্রি যাপনের অধিকার—যা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা স্বামীর যিম্মায় ওয়াজিব নয়, বরং আগামীতে ক্রমান্বয়ে ওয়াজিব হবে। এ ধরনের দাবী-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে সমঝোতা করা হলেও তা চিরতরে রহিত হবে না, বরং যে কোন সময় স্ত্রী বলতে পারবে, এতদিন আমি অধিকার ছেড়ে দিয়েছি, এখন আর ছাড়তে রাজী নই। আগামীতে আমার ন্যায্য অধিকার আমাকে দিতে হবে। এমতাবস্থায় স্বামীও আবার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অধিকার ফিরে পাবে। —(তফসীরে-মাযহারী)

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ —অর্থাৎ আর যদি স্বামী-স্ত্রী পৃথক হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে স্বাবলম্বী করে দেবেন। এই আয়াতে উভয় পক্ষকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, সংশোধন ও সমঝোতার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে যদি বিচ্ছেদ হয়েই যায়, তবে হতাশ ও বিহবল হওয়ার প্রয়োজন নেই, বরং আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে স্বাবলম্বী করে দেবেন। মহিলার জন্য নিরাপদ আশ্রয় ও অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা হয়ে যাবে, পুরুষের জন্যও অন্য স্ত্রী অবশ্যই জুটবে। আল্লাহ্র কুদরত অপার। অতএব, হতাশাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। বিবাহ-পূর্ব জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে তারা বুঝতে পারবে যে, এক সময় তারা একে অপরকে হয়ত চিনতও না। আল্লাহ্ তা'আলা উভয়কে একত্র করেছিলেন। অতএব, পুনরায় তিনি অন্যের সাথেও জোড় মেলাতে পারেন।

আয়াতের শেষে وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা সচ্ছলতা দানকারী, সুব্যবস্থাপক"—বলে এ বিশ্বাসকে আরো জোরদার করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কোন সংকীর্ণতা নেই। তাঁর সব কাজই যুক্তিসঙ্গত ও হিকমতপূর্ণ যদিও আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি না। কাজেই এ বিচ্ছেদের মধ্যে তাদের স্বার্থ ও সৌভাগ্যের চাবিকাঠি নিহিত থাকতে পারে। বিচ্ছেদের পরে হয়ত তারা এমন সাথী লাভ করবে যার সাহচর্যে তাদের জীবন সার্থক ও সুখময় হবে!

ইখতিয়ার-বহির্ভূত ব্যাপারে কোন জবাবদিহি করতে হবে না ঃ দাম্পত্য জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী ও সুখময় করার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী দান প্রসঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ অর্থাৎ "যতই চাও না কেন, তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না।" ইতিপূর্বে সূরা নিসার প্রথম দিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা

ও ন্যায়-নীতি বজায় রাখা অবশ্য কর্তব্য। যার ধারণা হবে, এ কর্তব্য আমি পালন করতে পারবো না, তার একাধিক বিয়ে করা উচিত নয়। এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً অর্থাৎ "আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে একজন স্ত্রীই যথেষ্ট।"

হযরত রসূলে করীম (সা) কথা ও কাজে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা ও ন্যায়-নীতি বজায় রাখার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তা লংঘন করার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। উম্মুল-মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়-নীতি ও সমদর্শিতা বজায় রাখার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। সাথে সাথে মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করতেন ঃ اللهم هذا قسمى فيما املك فلاتلمنى فيما تملك ولا املك অর্থাৎ "ইয়া আল্লাহ্! যতদূর আমার ইখতিয়ারভুক্ত তার মধ্যে আমি সমবন্টন ও সমব্যবহার করলাম। অতএব যা আমার ইখতিয়ার-বহির্ভূত কিন্তু তোমার ইখতিয়ারভুক্ত (অর্থাৎ আন্তরিক আকর্ষণ ও ভালবাসা) সে ব্যাপারে আমাকে অভিযুক্ত করো না।"

রসূলে করীম (সা)-এর চেয়ে অধিক সংযমী ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাসম্পন্ন আর কে হতে পারে? কিন্তু তিনিও মনের আকর্ষণকে ইখতিয়ার-বহির্ভূত বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে ওজর পেশ করেছেন।

সূরা নিসার প্রাথমিক আয়াতে বোঝা গিয়েছিল যে, স্ত্রীদের মধ্যে সর্বতোভাবে সমতা বজায় রাখা ফরয যার ফলে আকর্ষণ ও ভালবাসার ক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করা ফরয সাব্যস্ত হচ্ছিল। অথচ এটা স্বামীর ইচ্ছাধীন নয়। তাই এখানে মূল বক্তব্য স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তোমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা ফরয নয়, বরং খোরপোশ, আচার-ব্যবহার, রাত্রি যাপন প্রভৃতি তোমাদের ইখতিয়ারভুক্ত ব্যাপারেই সমতা ও ন্যায়-নীতি বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ উপদেশটি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যে কোন রুচিবোধসম্পন্ন মানুষ তা মানতে বাধ্য। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ـ

অর্থাৎ "যতই চাও না কেন, তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না। অতএব, এমনভাবে একদিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ো না, যাতে তাদের একজন মাঝপথে ঝুলে থাকে!

এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দুজন স্ত্রীর মধ্যে সমতা বজায় রাখার যতই চেষ্টা করো না কেন, মনের আকর্ষণ ও ভালবাসার দিক দিয়ে সমতা রক্ষা করতে পারবে না। কারণ এটা তোমাদের ইচ্ছাধীন নয়। তবে হাঁ, তোমরা এক দিকে ঝুঁকে পড়ো না; মনের আকর্ষণে উন্মত্ত হয়ে আদান-প্রদানের ব্যাপারেও তাকে অগ্রাধিকার দিও না যার ফলে অন্য স্ত্রী মাঝপথে ঝুলে থাকে। বেচারীকে অধিকারও দেবে না আর বিদায়ও করবে না, এমন যেন না হয়।

এই আয়াতে সমতা রক্ষা করাকে সাধ্যাতীত বলা হয়েছে। বস্তুত এটা আকর্ষণ ও অনুরাগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অতঃপর فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ অর্থাৎ "এক-দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ো না"---বাক্য দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে যে, আন্তরিক আকর্ষণ ও অনুরাগ তোমাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত হওয়ার কারণে ক্ষমার্হ। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব করে তোমাদের আয়ত্তাধীন ক্ষেত্রেও তাকে প্রাধান্য দেওয়া জায়েয নয়। এভাবে এই আয়াত সূরা নিসার প্রথম আয়াতের এই ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে, উক্ত আয়াত দ্বারা স্থূল দৃষ্টিতে আকর্ষণ ও অনুরাগে সমতা রক্ষা করা ফরয বোঝা গিয়েছিল। অতঃপর এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, এটা ক্ষমতা-বহির্ভূত হওয়ার কারণে ফরয নয়। শুধু আয়ত্তাধীন ক্ষেত্রেই সমতা ও ন্যায়-নীতি বজায় রাখা ফরয।

বহু বিবাহের বিপক্ষে দলিল পেশ করা ভুল ঃ উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা সেই সব লোকের ভ্রান্ত ধারণাও পরিষ্কার হয়ে গেল, যারা এ দু'টি আয়াতকে একত্র করে সিদ্ধান্ত নিতে চান যে, ইসলামে একাধিক বিবাহ জায়েয নয়। কারণ সূরা নিসার এক আয়াতে বলা হয়েছে, "যদি একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে অপারক হও, তবে আর বিয়ে করো না, বরং এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাক।" অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "যতই চেষ্টা করো না কেন, তোমরা কখনও একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না।" অতএব, একাধিক বিয়ে করাই জায়েয নয়।

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এহেন ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের উপকরণ যে অত্র আয়াতদ্বয়ের মধ্যেই নিহিত রেখেছেন, তা এঁদের নজরে পড়ে না। ২য় আয়াতে فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ অর্থাৎ একজনের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ো না, তাহলে অন্য স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা হবে---বলা হয়েছে অর্থাৎ একাধিক স্ত্রী রাখা জায়েয আছে, তবে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা অবিচার করা জায়েয নয়। প্রথম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً এখানে শর্ত আরোপ করে বলা হয়েছে, "যদি তোমরা আশংকা বোধ করো যে, সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীই যথেষ্ট।" এখানে "যদি তোমরা আশংকা বোধ করো" শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত

করা হয়েছে যে, সমতা রক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বা সাধ্যাতীত নয় এবং একাধিক বিবাহও সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ করা হয়নি। অন্যথায় দু'টি আয়াত ও দীর্ঘ ইবারতের কোন প্রয়োজন ছিল না বরং حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ আয়াতে যেমন ঐসব নারীর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যাদের সাথে বিয়ে হারাম এবং অন্য আয়াতে وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ বলে দু'বোনকে এক সময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখা হারাম করা হয়েছে; তদ্রূপ এক সাথে একাধিক বিয়েকে সরাসরি হারাম বলা হতো। এমতাবস্থায় "দু'বোন"কে একত্রে বিবাহ বন্ধনে রাখতে নিষেধ করার পরিবর্তে "দু'নারীকে" এক সময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে সরাসরি নিষেধ করাই সমীচীন হতো। এতদ্ব্যতীত "দু'বোন"কে একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে নিষেধ করায় বোঝা যায় যে, পরস্পর বোন না হলে একাধিক বিয়ে জায়েয।

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّٰهِ
مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلّٰهِ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾ إِنْ يَشَأْ
يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ
قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾

(১৩১) আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও জমীনে সবই আল্লাহ্‌র। বস্তুত আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা সবাই ভয় করতে থাক আল্লাহ্‌কে; যদি তোমরা তা না মান, তবে জেনো, সেসব কিছুই আল্লাহ্‌ তা'আলার যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও জমীনে। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন অভাবহীন, প্রশংসিত। (১৩২) আর আল্লাহ্‌রই জন্য সে সব কিছু, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও জমীনে। আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, কর্মবিধায়ক। (১৩৩) হে মানবকুল, যদি আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সরিয়ে তোমাদের জায়গায় অন্য কাউকে প্রতিষ্ঠিত করেন? বস্তুত আল্লাহ্‌র সে ক্ষমতা রয়েছে। (১৩৪) যে কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, তার জেনে